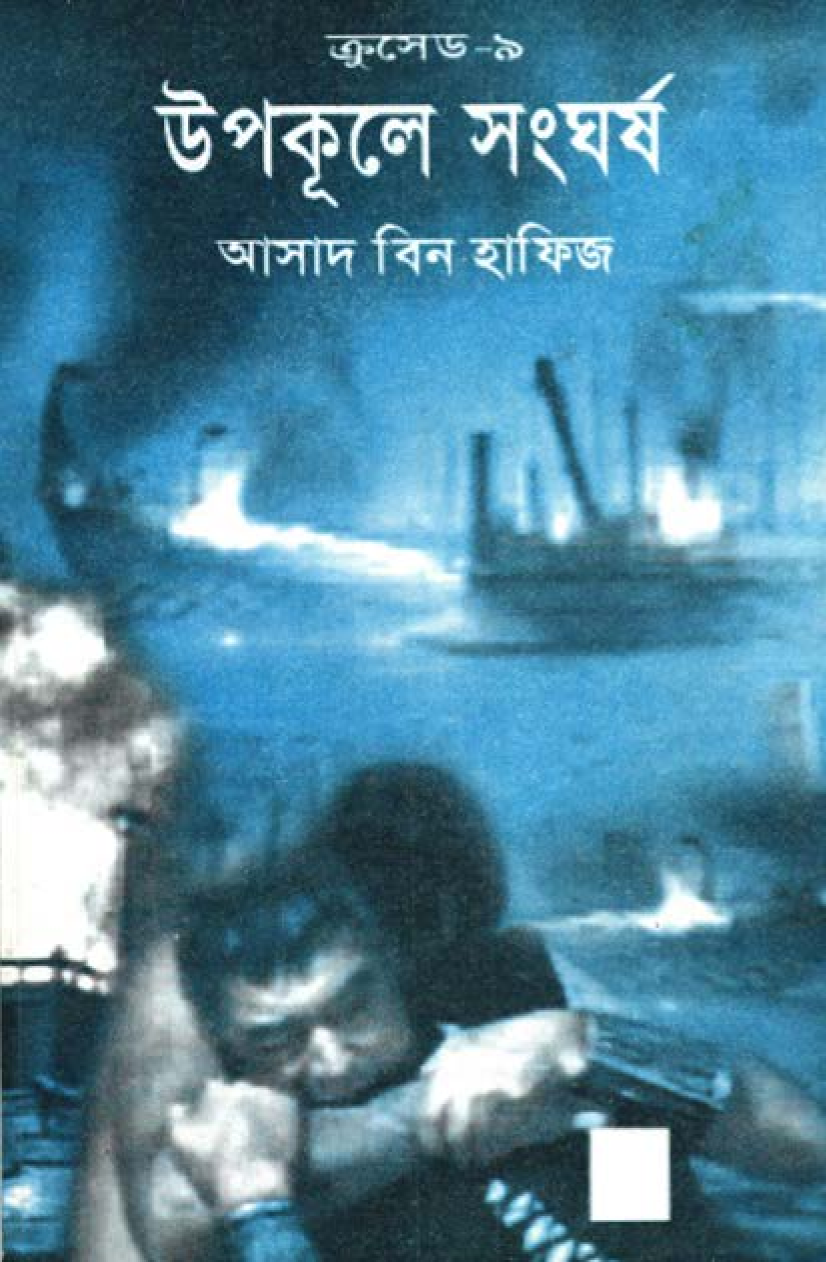
ক্রুসেড-৯

উপকূলে সংঘর্ষ

আসাদ বিন হাফিজ



ক্রুসেড - ৯

উপকূলে সংঘর্ষ

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, ৮৩১৯৫৪০ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

ক্রুসেড - ৯

উপকূলে সংঘর্ষ

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০১
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ [redacted] ৫০.০০

CRUSADE-9
Upokule Songharsa
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by
Asad bin Hafiz

Published by
Pritee Prokashon
435 ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, 8319540, Fax: 880-2-8319540
Published on: March 2001

PRICE : [redacted] ৫০.০০

ISBN 984-581-176-0

ক্রুসেড

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মরণপন লড়াই কাহিনী

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠলো খ্রিস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিল মদ ও নেশার দ্রব্য। ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী গোয়েন্দা। বড় বড় সেনা অফিসার এবং আমীর ওমরাদের হারেমগুলোতে ওদের ঢুকিয়ে দিল নানা কৌশলে। ভাসমান পতিতা ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। মদ, জুয়া আর বেহায়াপনার স্রোত বইয়ে দিল শহরগুলোতে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই – অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

ক্রুসেড

সেই সব শিহরিত, রোমাঞ্চিত ঘটনার শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনায় ভরপুর ইতিহাস আশ্রিত রহস্য সিরিজ

এ সিরিজের অন্যান্য বই

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন

এ সিরিজের পরবর্তী বই

সর্প কেল্লার খুনী

আগামী মাসে বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের ৩য় বই

তাওহীদুল ইসলাম বাবু রচিত

ব্ল্যাক আর্মির কবলে

পাঠকদের প্রতি–

✓প্রতি এক মাস অন্তর এ সিরিজের একটি খণ্ড বের হয়। প্রতি খণ্ডের দাম ৩০/=। আমরা চাই আপনি আপনার পাশের দোকান থেকেই প্রতিটি কপি সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে দোকানদারকে বই সংগ্রহে উৎসাহিত করুন।

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে–

✓ ডাকযোগে বই সংগ্রহ করতে পারেন। অগ্রীম টাকা পাঠানোর ভিত্তিতে পাঠককে ৩০% কমিশনে বই সরবরাহ করা হয়।

বই বিক্রেতাদের প্রতি–

✓জনপ্রিয় এ সিরিজের বই বিক্রি করে আপনিও হতে পারেন প্রচুর লাভবান। এজেন্ট ও বিক্রেতাদের সত্যিকার অর্থেই উচ্চ হারে কমিশন দেয়া হয়।

আলীর গোয়েন্দা বাহিনীর তিন সদস্য ইমরান, রহিম, রেজাউল। আক্রায় এসেছিল ওরা শত্রুর গতিবিধি ও পরিকল্পনা জানতে। এরই মধ্যে অনেক তথ্য ওরা সংগ্রহও করেছে। দলনেতা ইমরানের কাছে এমন কিছু তথ্য এলো যা এখুনি সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীকে জানানো দরকার। ওরা আক্রা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো, এমন সময় হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল রহিম।

যখন রহিমের রিপোর্ট করার কথা, তখন সে না আসায় তাকে খুঁজতে গিয়েছিল ইমরান। গিয়ে জানলো, যে বাড়িতে সে থাকতো এবং তার মালিকের দোকানে কাজ করতো সেখান থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কেন রহিমকে বরখাস্ত করা হয়েছে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিল না কেউ। রহিমকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ইমরান। একজন গোয়েন্দা যে কোন সমস্যা প্রথমে তার দলনেতাকে জানাবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু রহিম তা করেনি। কিন্তু কেন? তবে কি রহিম কোন বিপদে পড়েছে? ধরা পড়ে গেছে সে শত্রুর হাতে? কি হয়েছে তার? এসব অসংখ্য চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো ইমরানের মাথায়।

কমাণ্ডার হিসাবে রহিমের সন্ধান নেয়া তারই দায়িত্ব।

একবার ভাবলো, রেজাউলের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, পরিস্থিতি না বুঝে রেজাউলের সাথে দেখা করতে যাওয়াও এখন ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে সে আর রেজাউলে ওখানে গেল না।

ইমরান শংকিত হলো এই ভেবে, যদি রহিম গ্রেফতার হয়েই থাকে তবে তা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে! এই অবস্থায় চাপে পড়ে দুই বন্ধুর সন্ধান বলে দিতে পারে রহিম। তখন তাদেরও ধরা পড়তে হবে! এই চিন্তাই ইমরানকে অস্থির করে তুললো।

একজন গোয়েন্দার ধরা পড়া বা মারা যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু ভয় ও চিন্তার কারণ, সে তার অন্যান্য সাথীদের নাম বলে দিলে পুরো মিশনটাই ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়।

যে গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা এখানে এসেছিল, তা তাদের হাতে এসে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া দরকার। শেষ মুহূর্তে এসে এ ধরনের একটা সমস্যা পুরো মিশনকেই শেষ করে দিতে পারে।

একদিকে আত্মরক্ষা করে নিরাপদে আক্রা থেকে বেরিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে বন্ধুকে খুঁজে বের করার কঠিন দায়িত্ব– কোনটা করবে ইমরান? কিভাবে করবে? এক সুকঠিন দায়িত্বের বোঝা তাড়া করতে লাগলো ইমরানকে।

সূর্য ডুবে যাওয়ার এখনও কিছুটা দেরী। রেজাউল আস্তাবলের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। চারটি ঘোড়া এসে আস্তাবলের মুখে থামলো। একজন আরোহী ঘোড়ার পিঠে লাশের মত

একজনকে ফেলে রেখেছিল। তার সামনেই তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানো হলো। নামানোর পর লোকটিকে দেখেই রেজাউলের শরীরের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হীম হয়ে গেল।

এ লোক আর কেউ নয়, তারই সহযোগী, বন্ধু রহিম। তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা।

আরোহীদের সবাইকে চেনে রেজাউল। সবাই অফিসার। রহিমকে নামানোর পর এক অফিসার রেজাউলকে ডাকলো। এই অফিসার রেজাউলকে বেশ পছন্দ করতো, তাকে ডাকতো ফ্রান্সিস বলে।

অফিসারের ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে এল রেজাউল। দৌড়ে গেল অফিসারের কাছে। কিন্তু তার পা তখন চলতে চাচ্ছিল না। সে ভাবছিল, তাকেও কি গ্রেফতার করা হবে!

'এই ঘোড়া চারটি ভেতরে নিয়ে যাও।' অফিসার রেজাউলকে বললো, 'সহিসকে বুঝিয়ে দিয়ে এসে বন্দীকে ওই কামরায় নিয়ে চলো।' রহিমকে দেখিয়ে বললো অফিসার।

রেজাউলকে যখন ফ্রান্সিস বলে ডাকলো, তখন সে ভাবলো, রহিম তাদের বিষয়ে এখনো কিছু বলেনি। এ খৃস্টান অফিসার এখনও তাকে সহিস ফ্রান্সিস বলেই জানে। এই ভেবে সে একটু সাহস ফিরে পেল।

রেজাউল অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই বন্দী কে? এ লোক কি চুরি করেছে?'

'এ বেটা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা!' তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললো অফিসার, 'এখন এই গোপন কুঠরীতে পড়ে গোয়েন্দাগিরি করবে। যাও, ঘোড়া নিয়ে যাও।'

এই ফাঁকে রেজাউল ও রহিম একে অন্যের চোখে চোখ রেখে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। চোখে চোখে কথা হয় তাদের। ধরা পড়লে চোখের ইশারার কিভাবে কথা বলতে হবে সে সংকেত তাদের আগেই ঠিক করা ছিল।

যদি কোনদিন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, পরস্পর কথাও বলতে পারবে না, তখন ইশারায় অন্যকে পালিয়ে যাওয়ার যে সংকেত দেয়ার কথা, রহিম রেজাউলকে সে সংকেত দিল।

কিন্তু রেজাউল তার উল্টো অর্থ করে বসল। সে ভাবল, এখন পালিয়ে যাওয়ার সংকেত দেয়ার মানে হচ্ছে, রহিম আমাদের পরিচয় এখনো ফাঁস করেনি।

ফলে সে পালিয়ে না গিয়ে রহিমকে উদ্ধার করার কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় কিনা সে জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

যদিও এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যে প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল তবু সঙ্গীর কথা চিন্তা করে সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। কারণ সে জানতো, এ ধরা পড়ার মানে কি এবং এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে।

বন্দীশালায় একজন গোয়েন্দার ওপর কেমন উৎপীড়ন হয় তা তার অজানা নয়। সে জানে, উদ্ধার করা সম্ভব না হলে রহিমকে এখন মরতে হবে। কিন্তু মরাটাই বড় কথা নয়, এ মৃত্যু যে কত বড় যন্ত্রণাদায়ক সে কথা ভেবেই শিউরে উঠল তার শরীর।

রেজাউল এও জানতো, রহিমকে এখন যে কামরায় রাখা হয়েছে সেখান থেকে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে।

০

ইমরান গির্জা সংলগ্ন এক কামরায় অস্থির চিত্তে পায়চারী করছে আর চিন্তা করছে, রহিম নিখোঁজ হয়ে গেল কোথায়? এখন তাকে আমি কোথায় খুঁজে বেড়াবো?

এমন সময় কামরার দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। রেজাউল প্রবেশ করলো ভেতরে। সে ভেতরে এসেই দরজা বন্ধ করে, ভীত কণ্ঠে ফিসফিস করে বললো, 'রহিম ধরা পড়েছে!'

সে যেমন দেখেছে ইমরানকে সব খুলে বললো। শেষে বললো, 'সে এখনো আমাদের কথা কিছু বলেনি!'

'যদিও বলেনি কিন্তু টর্চার সেলে গেলেই বলে দেবে।' ইমরান বললো, 'সেই দোজখের নির্যাতনে মুখ বন্ধ রাখা সহজ ব্যাপার নয়।'

অবস্থা ভয়াবহ জটিল। এ অবস্থায় কি করা যায় তা নির্ধারনের জন্য দু'জনে পরামর্শে বসলো। তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না, তারা এখনই বেরিয়ে যাবে, না রহিমকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করবে?

রেজাউল বললো, 'আমাদের সামনে সংকটটি খুবই স্পর্শকাতর ও জটিল। এ মুহূর্তে সামান্য ভুল আমাদের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো এবং একটা ভুল এরই মধ্যে আমরা করেও ফেলেছি। ভুলটা হলো, আমরা একটু বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের অসীম ধৈর্য ও সহ্যগুণের প্রয়োজন। আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু করা আমাদের সাজে না।'

'যদি নিজেদের কোন সাথী বিপদে পড়ে?'

'যদি তাকে সাহায্য করতে গেলে অন্যদেরও ফেঁসে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে তাকে সাহায্য করতে যাওয়া বোকামী। রেজাউল, আবেগের বশে চলার সময় এটা নয়!"

ইমরানের কথায় রেজাউলের আবেগে মোটেই ভাটা পড়লো না। সে জেদের সাথে বললো, 'রহিমের মত সুন্দর ও সাহসী বন্ধুকে বন্দী রেখে আমরা পালাতে পারি না। তাকে মুক্ত করার চেষ্টা আমি অবশ্যই চালাবো।'

'অসম্ভব!' ইমরান বললো, 'এমন ভয়ঙ্কর সংকল্প ত্যাগ করো, নইলে আমরা উভয়েই বিপদে পড়বো। সবচে বড় কথা, যে তথ্যের জন্য আমরা এখানে এসেছিলাম, তা আমরা পেয়ে গেছি। সবার আগে এ তথ্য পৌঁছানো আমাদের জন্য ফরজ।'

রেজাউল বললো, 'আমি যেখানে থাকি সেখানেই রহিমকে রাখা হয়েছে। ফলে তাকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা করার সুযোগ আছে আমার। এ সুযোগ না থাকলে আমি কোন অনুরোধ করতাম না। আমাকে অন্তত একটা দিন সময় দাও, যদি এর মধ্যে সফল না হই তবে আমার আর কোন আফসোস থাকবে না। নইলে তার মৃত্যুর জন্য আজীবন কষ্ট হবে আমার।'

'কিন্তু তুমি একা কি করে একটা বাহিনীর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে?'

রেজাউল বললো, 'আমি একা ঠিকই, কিন্তু সেখানে এরই মধ্যে অনেকে আমার বন্ধু হয়ে গেছে। তাদের সাহায্য আমি পাবো। যদি তার কাছে একবার পৌঁছতে পারি, তবে

তাকে মুক্ত করার পথ একটা পেয়েই যাবো আশা করি।'

'কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, যদি নিজেও ধরা পড়ে যাও দুশমনের হাতে?'

'যদি আমি ধরা পড়ি, তুমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। আমাদের মুক্ত করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করবে না। যে তথ্য পাচার করা দরকার সেই গোপন তথ্য সবই তোমার কাছে আছে। তুমি পালাতে পারলেই আমাদের মিশন সফল হয়ে যাবে। আমি রহিমকে ছাড়া যাবো না। ওর জন্য আমাকে ছেড়ে দাও।'

ইমরান আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকল। রহিমের জন্য তার যে মায়া ছিল না বা কষ্ট হচ্ছিল না, তা নয়। কিন্তু কর্তব্য-চিন্তা তাকে কঠোর করে তুলেছিল।

ইমরানকে দুর্বল হতে দেখে রেজাউল এবার বলল, 'ঠিক আছে, আমার কথা শোন। রহিমের মুক্তির যদি কোন উপায় না দেখি, তবে রাতেই আমরা বের হয়ে যাবো। তুমি সজাগ থেকো, আমি তার খবর নিয়ে রাতের যে কোন সময় এসে তোমাকে রিপোর্ট করে যাবো। ওকে মুক্ত করার কোন সম্ভাবনা থাকলেই কেবল আমি অপেক্ষা করবো, নইলে তোমার সঙ্গী হবো।'

'ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রাখছি।'

রেজাউল তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাস্তায় পথ চলার সময়ও তার মাথায় রহিমের মুক্তির চিন্তাই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছিল।

রহিমকে মুক্ত করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সে কোন সাধারণ চোর ডাকাত ছিল না, সে ছিল এক রাষ্ট্রীয় অপরাধী। সেনানিবাসের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বন্দী সে। কিন্তু রেজাউলের আবেগ তাকে দুঃসাহসী ও বেপরোয়া করে তুলল। আর সেই আবেগের বশে সে তার মূল দায়িত্বও ভুলে গেল।

ইমরানের দায়িত্ব ছিল ঘোড়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ঘোড়ার ব্যবস্থা করাও সহজ হলো না। পাদ্রীর বডিগার্ডদের ঘোড়া সেখানে থাকে ঠিকই, কিন্তু পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখান থেকে ঘোড়া চুরি করা ছিল বলতে গেলে অসম্ভব।

•

তখন পর্যন্ত রহিমকে কয়েদখানায় পাঠানো হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে গোয়েন্দা বিভাগের দুই পাষণ্ড অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

গোয়েন্দারা ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে তথ্য ও গোপন কথা আদায় করাই প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সবাই জানে, গোয়েন্দারা কখনও একা থাকে না, তাদের একটি সংঘবদ্ধ দল থাকে। একজন ধরা পড়লে তার কাছে থেকেই তার সাথীদের সন্ধান পাওয়া যায়। কি কি গোপন বিষয় সংগ্রহ করেছে জানা যায়।

রহিমের কাছ থেকে এ সকল তথ্য আদায় করার জন্য তাকে এক কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'একজন গোয়েন্দা হিসাবে অনেক গোপন খবরই তোমার জানা থাকার কথা। বলো, আমাদের কি কি গোপন খবর তুমি সংগ্রহ করেছো?'

রহিম উত্তরে বললো, 'আমি তোমাদের কোন গোপন বিষয়ই জানি না।'

'বণিকের মেয়ের সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক ছিল?'

'আমাদের দু'জনের মধ্যে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে।'

'রয়েছে নয়, বলো, ছিল। কখন তুমি আলিসাকে নিয়ে পালানোর পরিকল্পনা করো?'

'আলিসার বিয়ে এক বৃদ্ধ অফিসারের সাথে হতে যাচ্ছিল, সে কারণে সে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল এবং আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিল।'

'তুমি কি জানো, তুমি কেমন করে ধরা পড়লে?'

'না!' রহিম উত্তর দিল, 'আমি শুধু এটুকুই জানি, আমি ধরা পড়েছি!'

'তুমি আরও অনেক কিছু জানো।' এক অফিসার বললো, 'সব কথা বলে দাও, তোমাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না।'

'আমি এটুকুই জানি, আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন হয়ে পড়েছিলাম। তার ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এখন আমি আমার পাপ ও কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি ভোগ করবো। তোমরা আমাকে যে ধরনের কষ্ট ও শাস্তি দিতে চাও, দিতে পারো, আমি হাসি মুখেই তামার পাপের শাস্তি গ্রহণ করবো।'

'তোমার দীলে কি এখনো আলিসার জন্য ভালবাসা আছে?'

'হ্যাঁ, এখনও আছে!' রহিম বললো, 'আর চিরকাল

থাকবে। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে কায়রো যেতে চেয়েছিলাম, সেখানে ইসলামী বিধান মতে সংসার গড়তে চেয়েছিলাম।'

'যদি আমি বলি, সে তোমার সাথে প্রতারণা করেছে, তুমি তা মানবে?'

'না।' রহিম বললো, 'যে আমার জন্য তার পিতা-মাতা ও বাড়ীঘর ত্যাগ করতে পারে, সে কখনও ধোঁকা দিতে পারে না। বরং তাকে অন্য কেউ ধোঁকা দিয়েছে।'

'যদি আমি আলিসাকে তোমার সামনে হাজির করি, তবে কি তুমি বলবে, তোমার সাথে আক্রাতে আর কতজন এসেছে? এখন তারা কোথায় আছে?'

রহিম চুপ করে রইল, এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'তুমি কি বলবে, তুমি এখান থেকে কোন কোন গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছো?'

এবারও রহিম নিরুত্তর। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এক অফিসার এগিয়ে এসে তার মাথা উপরে তুলে ধরলো। রহিমের দুই চোখে তখন টলমল করছে অশ্রু।

অফিসার বারবার একই প্রশ্ন করল, কিন্তু সে এর কোন জবাব দিল না। সে অস্বীকার করে এ কথা বলল না যে, আমার কোন সঙ্গী সাথী নেই। আবার কে কোথায় আছে সে কথাও বলল না। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল, তার ভেতরে চরম টানাপোড়েন চলছে। সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সে এ প্রশ্নের জবাব দেবে কি দেবে না, দিলে কি দেবে ঠিক করতে পারছে না। তার চোহারা বলছিল, আলিসার জন্য এখনো সে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে।

'তোমাকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।' এক অফিসার বললো, 'আমরা চেয়েছিলাম তোমার কষ্ট কমাতে। এ জন্য তোমাকে একাধিকবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বার বার একই প্রশ্ন করার পরও তুমি কোন জবাব দাওনি। কিন্তু কি করে একজন বেয়াড়া গোয়েন্দার কাছ থেকে কথা আদায় করা হয় সে কথা তোমার অজানা থাকার কথা নয়। তবু যখন তুমি কথা বলছো না, বাধ্য হয়ে আমাকে সে পথই ধরতে হবে। শেষ পর্যন্ত তুমি যখন একটি হাড় ও মাংসের স্তূপ হয়ে যাবে তখন আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না।

তুমি বাঁচবে কি মরবে আমার সে চিন্তা করার দরকার নেই। তবে যদি এখনো উত্তর দিয়ে দাও, তবে অনেক কষ্টের হাত থেকে বেঁচে যাবে তুমি। আর আলিসার কথা যদি জানতে চাও তো বলি, আলিসা চায় না তুমি এত তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাও। তোমার সাথে এই যে ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে এটাও অনেকটা আলিসার জন্যই।

রাজ সাক্ষীকে ক্ষমা করার একটা বিধান দুনিয়া জোড়াই চালু আছে। ইচ্ছে করলে সে সুযোগ তুমি নিতে পারো। তাহলে আলিসার একটা ইচ্ছা পূরণ করার অবকাশ পাবো আমরা। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন আলিসা দেখছে, তার সে স্বপ্ন পূরণ হবে। আলিসাকে যদি তুমি চাও তবে সে সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি।'

অফিসার বলে চললো, 'এটা কয়েদখানা নয়। তুমি এখন একজন অফিসারের কামরায় আছো। যদি তুমি চিন্তা করার

সময় চাও তবে আজ রাত তোমাকে এখানেই রাখা হবে।'

রহিম নিরব, নিস্তব্ধ। বোবা চোখ মেলে সে ফ্যালফ্যাল করে অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অফিসারদেরও তেমন ভয় ছিল না যে, সে পালিয়ে যাবে। উঠানে ও সামনে সব সময় পাহারাদার থাকে। তাছাড়া সামরিক এলাকার কড়া পাহারা থেকে পালিয়ে ও যাবেই বা কোথায়?

এক অফিসার তার সঙ্গীকে বললো, 'কেন তুমি অযথা সময় নষ্ট করছো। একে গোপন ঘরে নিয়ে যাও। লোহার উত্তপ্ত শলাকা তার গায়ে লাগাও, দেখবে সে সব কথাই গড়গড় করে বলে দিচ্ছে। যদি তাতেও কাজ না হয় তবে ক্ষুধা ও পিপাসায় ফেলে রাখো দু'একদিন।'

অন্য অফিসার তাকে ইশারায় কামরার বাইরে আসতে বললো। দুজনই বাইরে এলে সে বললো, 'আমার পরীক্ষা অন্য রকম বন্ধু! এ কথা ভুলে যেও না, এরা মুসলমান! তুমি এ পর্যন্ত কতজন মুসলমানের কাছ থেকে গোপন তথ্য বের করেছ? তুমি কি জান, এই কমবখ্‌ত জাত একবার যদি মুখ বন্ধ করে তবে মরে যাবে, তবুও মুখ খুলবে না। এ বেটা তো বলেই দিয়েছে, সমস্ত উৎপীড়ন ও শাস্তি তার গোনাহের সাজা হিসেবে গ্রহণ করে নিবে।'

'এ বেটা দেখছি পাকা মুসলমান!'

'হ্যাঁ, একে টর্চার সেলে নিলেও সে বলবে, আমি কিছু জানি না। আমার উদ্দেশ্য ওকে হত্যা করা নয়, আমার শুধু জানা দরকার, তার সাথীরা কে কোথায় আছে? আর জানা দরকার, মিশরে আমাদের আক্রমণ করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া

হয়েছে সে তথ্য সে জানে কি না।'

'ওর বাবারও তা জানা সম্ভব নয়!' অন্য অফিসার বললো, 'হাইকমাণ্ডের মুষ্টিমেয় অফিসার ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউই অবগত নয়। এই গোয়েন্দা বণিকের মেয়ের ভালবাসায় বন্দী হয়ে আছে, তার তো দুনিয়ার আর কোন খবরের দরকার নেই। আমার তো এ কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না, আলিসাই তাকে গ্রেফতার করিয়েছে। কারণ, সে এখনও এই উজবুকের প্রেমে পাগল হয়ে কান্নাকাটি করছে।'

অফিসার তাকে নিয়ে কামরার বাইরে এল। বললো, 'বুদ্দু, আলিসাকেই আমি এ ব্যাপারে ব্যবহার করতে চাই। আলিসাকে আজ এই কামরাতেই এনে রাখা হবে। আমি আশা করি, যে গোপন রহস্য আমরা কয়েকদিন চেষ্টা করেও স্বীকার করাতে পারবো না, আলিসার মত যুবতী মেয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই গোপন খবর জেনে নিতে পারবে।'

'একটা মেয়ের ওপর এতটা ভরসা করা কি ঠিক হবে?' সন্দেহের সুর সঙ্গী অফিসারের কণ্ঠে।

'এখনও তোমার মনে সন্দেহ কাজ করছে! শোন, তুমি তো এখনও সব কথা শোনইনি। আলিসা ফিরে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা জানতে পারলে বুঝতে, আলিসা কতটা কাজের। এ বন্দীর কাছ থেকে কথা বের করার দায়িত্ব যেহেতু আমাদের দু'জনের, তাই সব কথা তোমার জানা দরকার।

আলিসা ঐ লোকটাকে গভীরভাবে ভালবাসতো। একজন নির্যাতীত খৃস্টান ও উদ্বাস্তু পরিচয়ে লোকটা তাদের কাছে আশ্রয় নেয়। পরিচয়ের সময় এ যুবক তার নাম বলে, 'ইলিমোর'।

আলিসার বাবা কমাণ্ডার ওয়েস্ট মেকর্ডের সাথে মেয়ের বিয়ে পাকা করলে মেয়ে এই বিয়েতে বেঁকে বসে। কমাণ্ডার মেকর্ডকে আলিসা 'বুড়ো ভাম' বলে গালি দেয় এবং অপমান করে।

বাপ চাচ্ছিল কমাণ্ডারকে মোটা ঘুষ হিসাবে কন্যা দান করতে। কিন্তু সুদর্শন যুবক ইলিমোরের প্রেমে পড়ে মেয়ে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে বসল।

মেকর্ড যুবককে খুন করার হুমকি দিলে ঘটনা জটিল আকার ধারণ করে। নিরূপায় হয়ে ওরা পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় যুবকটি যখন অনুভব করল, এখন আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই, তখন রাতে বিশ্রামের সময় সে তার আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয় আলিসার কাছে। আলিসাকে সে বলে, 'আমি ইলিমোর নই, আমার নাম রহিম। আমি একজন মুসলমান এবং আইয়ুবীর গোয়েন্দা।'

আলিসা মনে করেছিল, ইলিমোর তামাশা করছে। কিন্তু এ যুবক তাকে বিশ্বাস করায়, সে মোটেও হাস্যি তামাশা করছে না, সে বাস্তবিকই মুসলমান এবং তার নাম রহিম।

রহিম জানতো না, আলিসার মনে মুসলমানদের প্রতি প্রচণ্ড ভয় ও ঘৃণা জমা হয়ে আছে। খুব শিশুকাল থেকেই এই ভীতি ও ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল তার মনে। রহিমের এ কথাও জানা ছিল না, সে একজন অন্ধ খৃস্ট ভক্ত ও খৃস্ট ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। তার ধর্মপ্রীতি এত প্রবল যে, এ জন্য সে দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করতে পারে।

আলিসা যখন বুঝলো, তার প্রেমিক তার সঙ্গে প্রতারণা

করেছে, তখন তার হৃদয়ে ভয়ের এক শিহরণ বয়ে গেল। তার মনে হলো, যে লোক ভালবাসার নামে প্রতারণা করতে পারে, সে লোক পারে না এমন কোন অপকর্ম নেই। এ ধরনের লোক কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না।

এ লোক একবার তাকে কায়রো নিয়ে যেতে পারলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে কল্পনা করে শিউরে উঠল আলিসা। সে শুধু নিজেই তাকে ভোগ করবে, অন্যের দ্বারা তাকে নষ্ট করবে না এর নিশ্চয়তা কি?

যে লোক তাকে মিথ্যা কথা বলে ঘর থেকে বের করতে পারে সে লোক সাধ মিটে গেলে যদি তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয় তাহলে কি করতে পারবে আলিসা?

শিশুকাল থেকে মন-মগজে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও খারাপ ধারণা জমা ছিল, সেই সব ভয়ংকর দৃশ্য আলিসার সামনে ভেসে উঠতে লাগল। প্রেমিকের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠল তার মন।

আলিসার মনে মুসলমান প্রেমিকের চেয়ে ধর্মের প্রতি ভালবাসা প্রবল হয়ে উঠল। রাতে তার প্রেমিক ঘুমিয়ে গেলে ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে এল আলিসা।

তার মনে তখন প্রতিশোধের দাউ দাউ আগুন। প্রতিশোধ স্পৃহায় তার চেহারা তখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সে এ কথা একবারও ভাবল না, আক্রা ফিরে গেলে তার বাবা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? ভাবল না, সেই বুড়ো অফিসার আবার হামলে পড়বে তাকে বিয়ে করার জন্য। তার মনে তখন একটাই চিন্তা, একটাই শপথ, যে করেই হোক মুসলমানদের

অনিষ্ট করতে হবে। সর্বাবস্থায় তাদের শত্রু মনে করতে হবে। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ক্রুশের নামে শপথ নিল সে।

আলিসা ছিল খুব সাহসী ও চতুর মেয়ে। পালাবার ব্যাপারে সে এক নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরী করল। রহিমকে তার মনোভাব কিছুই জানতে না দিয়ে সেও শুয়ে পড়ল তার সাথে। রহিম যখন গভীর ঘুমে মগ্ন তখন আলিসা ঘোড়ার ওপর আরোহন করে এমন চুপিসারে পালিয়ে আসে যে, রহিম তার কিছুই টের পায়নি।

যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই ফিরে এলো আলিসা। ভোর হওয়ার আগেই আক্রা এসে পৌঁছলো। বাবার কাছে গিয়ে সব অপরাধ স্বীকার করে রহিম সম্পর্কে সব কথা বলে দিলো তাকে।

তার পিতা তখনই কমাণ্ডার ওয়েস্ট মেকর্ডকে এই ঘটনা জানালো। কমাণ্ডার তিনজন সৈন্য সাথে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো রহিমের সন্ধানে।

সকালে ঘুম থেকে জেগে রহিম দেখে ঘোড়াসহ আলিসা উধাও। অগত্যা সে মরুভূমি থেকে লোকালয়ে পৌঁছার জন্য পায়ে হেঁটেই রওনা দিল। কিন্তু পায়ে হেঁটে সে আর কতদূর যাবে? মেকর্ড-এর হাতে অচিরেই ধরা পড়লো সে। এখন সেই প্রেমিক গোয়েন্দা আমাদের হাতে।'

'কিন্তু রহিম জানে না, আলিসা তাকে ধোঁকা দিয়েছে?'

'না। এ জন্যই আমি এখন আলিসাকে ব্যবহার করতে চাই। আমি রহিমকে খুব ভাল খাবার খেতে দেবো এবং আরাম আয়েসে রাখবো যাতে সে বিভ্রান্ত হয়।'

সেনানিবাসের অফিসার্স কোয়ার্টার। সকল চাকর-বাকর ও লোকজনের মুখে একই কথা, একজন মুসলিম গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। রেজাউলও ফ্রান্সিস পরিচয়ে সেই চাকরদের সঙ্গে আছে। অন্যদের সাথে সেও সমান তালে মুসলিম গোয়েন্দাকে গালমন্দ করে যাচ্ছে।

সে গালমন্দ করছে, আর জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে, 'এই গোয়েন্দাকে ফাঁসি দেয়া হোক। আর তা না হলে তাকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে ঘোড়া ছুটানো হোক।'

রেজাউল জানে, রহিম এখনও সেই কামরাতেই আছে। রেজাউলের মত অন্যরাও বন্দীকে কয়েদখানায় পাঠানো হচ্ছে না দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল। বাবুর্চীখানার এক লোক বললো, 'কয়েদীকে আজ অফিসারের খাবার দেয়া হবে।'

যখন সে সত্যি সত্যি কয়েদীর জন্য অফিসারদের খাবার নিয়ে গেলো তখন সকলেই একে অন্যের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।

রেজাউলের বিস্ময় তখন চরমে। সে বাবুর্চীখানার লোককে এক সময় আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'এর মানে কি? মুসলমান গোয়েন্দাকে এত জামাই আদর করা হচ্ছে কেন! যে খাবার আমাদের ভগ্যে জুটে না সে খাবার দেয়া হচ্ছে কয়েদীকে! তবে কি এ লোক আসলে কোন গোয়েন্দা নয়?'

'কি বলছো তুমি! তুমি তো জানো না, এ বড় ভয়ংকর গোয়েন্দা!' চাকর তার বিদ্যা জাহির করে বললো, 'যে অফিসার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, আমি নিজে তার মুখ থেকে

শুনেছি, এ কয়েদীকে কেবল ভাল খাবারই দেয়া হবে না, তার জন্য নাকি রূপসী কোন মেয়েও জোগাড় করা হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর সেই মেয়েকে তার কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'বলো কি!' চোখে মুখে চরম বিস্ময় ফুটিয়ে বললো রেজাউল।

'হ্যাঁ, এই মেয়ে নাকি গোয়েন্দার পেট থেকে কথা বের করবে।' বলল চাকর।

রহিমের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আলিসাকে নিয়ে তার কামরার দিকে এগিয়ে গেল অফিসার দু'জন। কামরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। আলিসাও দাঁড়াল তাদের সাথে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল অফিসারদের দিকে।

অফিসাররা আবারো তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলল, তাকে কি করতে হবে, বন্দীকে কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর ইশারা করল তাকে কামরায় প্রবেশ করার।

আলিসা আলতো পায়ে কামরায় প্রবেশ করলো।

আলিসাকে দেখেই চমকে উঠল রহিম। অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভাবলো, স্বপ্ন দেখছি না তো!

'তুমি?' সে আলিসাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকেও কি গ্রেফতার করে আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ! গত রাতেই ওরা আমাকে বন্দী করে এখানে নিয়ে এসেছে।' বললো আলিসা।

'কিন্তু কেমন করে ওরা তোমাকে বন্দী করলো! আমি তো তোমার উধাও হওয়ার রহস্য কিছুতেই উদ্ধার করতে

পারছিলাম না? তুমি পালিয়ে গেছো এটা যেমন মেনে নিতে পারছিলাম না, তেমনি তুমি গ্রেফতার হয়েছো এ কথাও কল্পনা করতে পারছিলাম না।'

'আমি কেমন করে পালাতে পারি!' আলিসা বললো, 'আমার তো বাঁচা মরা তোমার সাথে। তুমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও আমার যখন ঘুম আসছিল না তখন আমি উঠে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জোসনা রাতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মরুভূমিতে হাঁটতে বেশ ভালই লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে সরে এসেছি, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে আমার মুখ চেপে ধরলো। তার হাত থেকে ছুটার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। চিৎকার করে তোমাকে ডাকতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাও পারলাম না।

ওরা ছিল দু'জন। একজন আমাকে ধরে রাখলো, আরেকজন বেঁধে ফেলল আমার হাত, মুখ। তারপর একজন গিয়ে আমার ঘোড়া নিয়ে এলো। আমার মুখ তখন বন্ধ, তোমাকে ডাকতে গিয়েও পারিনি। ওরা আমাকে সোজা এখানে নিয়ে এলো।'

'ওদেরকে কে বলেছে, আমি ইলিমোর নই, রহিম?' রহিম বললো, 'যারা তোমাকে ধরে নিয়ে এলো তারা আমাকে কেন ধরে আনলো না? আমাকে কেন হত্যা করলো না?'

'আমি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না!' আলিসা বললো, 'আমি নিজেই এখন আসামী। হয়তো তোমার সাথে লড়াই করার সাহস হয়নি ওদের?'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছো আলিসা!' রহিম বললো,

'তোমাকে ধমকিয়ে আমার সম্পর্কে জেনে নিয়েছে, আর তুমি ভয়ে বলে দিয়েছ আমি কে? তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি কখনও তোমার কষ্ট সহ্য করতে পারবো না।'

'যদি তোমার মনে আমার জন্য এতই দরদ, তবে ওরা যা প্রশ্ন করছে তার সঠিক জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমি সঠিক জবাব না দিলে ওরা আমার ওপর টর্চার করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। ওরা আরো বলেছে, যদি তুমি ওদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও তবে আমার ভালবাসার খাতিরে ওরা তোমাকে মুক্ত করে দেবে এবং আমাদের বিবাহ বন্ধনে সাহায্য করবে।'

'বাহ্ আলিসা, বাহ্!' রহিম ব্যঙ্গ করে বললো, 'তুমি এরই মধ্যে এই চুক্তিও করে ফেলেছো যে, আমি সমস্ত কথা বলে দিলে ওরা আমাকে মুক্ত করে দেবে আর সেই সঙ্গে তোমার সাথে বিয়েও দিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ' আলিসা বললো, 'তবে শর্ত হলো তোমাকে খৃস্টান হতে হবে।'

'তুমি কি এই আশা নিয়েই এখানে এসেছো যে, মুক্তির ওয়াদা পেয়েই আমি আমার সত্য ধর্ম ত্যাগ করবো? আলিসা! আমি সামরিক বিভাগের কোন সাধারণ সৈনিক মাত্র নই, আমি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা! মাথায় কিছু বুদ্ধিও রাখি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের ওপর তোমার ভালবাসা কিছু সময়ের জন্য জায়গা করে নিয়েছিল। এটাই আমার পাপ ও ভুল। আর এই ভুলই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করো না। যে ক্রুশের

নামে তুমি কসম খাচ্ছো, সেই ক্রুশ গলায় ধারণ করে তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলছো! ছি! আলিসা, ছি! তুমি কি অস্বীকার করতে চাও যে, তুমি স্বেচ্ছায় এবং একাকীই সেখান থেকে পালিয়ে আসোনি?

আমি জানি, তোমার অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা রয়েছে, সেই ঘৃণাই তোমাকে আমার কাছ থেকে পালিয়ে আসতে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা ও বিশ্বাস বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। ফলে তুমি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিশাল মরুভূমিতে একাকী ফেলে নিজের ঘোড়া নিয়ে চলে আসতে পেরেছো আর তোমার বুড়ো হবু স্বামীকে আমার সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছো।

আমি তোমার জাতিকে আমার শত্রু মনে করি। আমার জাতির বিরুদ্ধে তোমার জাতি যে ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তার মোকাবেলা করার জন্য আমি নিজের জীবন কোরবানী করার শপথ নিয়েই এখানে এসেছি। কিন্তু তোমার কারণে আমি আমার কঠিন দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিলাম। ভালবাসার দাবী মিটাতে গিয়ে আমি আমার ভবিষ্যত ধ্বংস করেছি, তার বিনিময়ে তুমি গোখরা সাপ হয়ে এসেছো আমাকে দংশন করতে?'

সে এমন ভঙ্গিতে কথা বলছিল যে, আলিসার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার অন্তরে রহিমের জন্য একদিন যে ভালবাসা জমা করেছিল, সেই ভালবাসা এসে ভর করছিল আবার।

রহিম তার চোখে চোখ রেখে ধীরে সুস্থে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে যখন কথা বলছিল, তখন এই যুবতী তার অন্তরের

আবেগ আর চেপে রাখতে পারছিল না।

প্রথমে তার চেহারার রঙ পাল্টে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সে তার কান্না দমন করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা।

সে অস্থির হয়ে রহিমের দু'টি হাত চেপে ধরলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'ইলিমোর, বিশ্বাস করো, তোমার প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই। তুমি তোমার ফরজ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে যে ভুল করেছো আমার ভুল তার থেকে কোন অংশেই কম নয়। আমি সত্যি অপরাধী, আমিই তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি।

আমি জানি এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। এর জন্য আমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। জীবনের প্রথম ভালবাসাকে হারাতে হবে। হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ বৃদ্ধ কমাণ্ডারের সাথে আমার বিয়ে হবে। সেই বন্য পশুকে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে আমার। ইলিমোর! আমাকে বাঁচাও, খুন করো আমাকে।'

'আমাকে আর ইলিমোর বলো না, আবদুর রহিম বলো, আমি ইলিমোর নই, আবদুর রহিম!'

o

অফিসার দুজন পাশের কামরায় বসে শরাব পান করছিল। তাদের বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। এর কারণ ছিল আলিসা। অফিসার দু'জনের বিশ্বাস, আলিসা একবার এ যুবকের কাছে গেলেই সে মোমের মত গলে যাবে এবং হঠাৎ করে আলিসাকে কাছে পাওয়ার আনন্দে অতি সহজেই গড়গড় করে

সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে। সকাল হওয়ার আগেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে এবং তারা সেই তথ্য অফিসে জমা দিয়ে প্রমাণ করবে, বন্দীর কাছ থেকে তথ্য আদায়ে তারা কতটা পারঙ্গম।

রহিমের কামরার বাইরে দরজার সামনে এক পাহারাদার বসেছিল চুপচাপ। কামরার পিছন দিকটা ছিল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পা টিপে টিপে একটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো কামরার দিকে। মূর্তিটি ছিল রেজাউলের।

ওদিকে ইমরান গীর্জা সংলগ্ন নিজের কামরায় বসে নির্ঘুম চোখে প্রচণ্ড অস্থিরতায় ছটফট করছিল। জেগে জেগে রাত কাটাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে উঠে পায়চারী করছে। সামান্য একটু আওয়াজ হলেই চমকে উঠে ছুটে যাচ্ছে দরজার দিকে। তার কাছে প্রতিটি শব্দই রেজাউলের শব্দ মনে হচ্ছিল।

গভীর রাত। সে অতি সাবধানে কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। পা টিপে টিপে আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল। তিনটি ঘোড়া বাছাই করলো ভাল দেখে। আটটি ঘোড়া বাঁধা ছিল এক সাথে। তার থেকে ঘোড়া তিনটি আলাদা করলো। জ্বিনগুলোও চুপিচুপি পৃথক করে রাখলো।

সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল, এই বুঝি রেজাউল ও রহিম চলে এলো! কিন্তু যতই রাত বাড়ছিল, ততই তার আশা-আকাঙ্খা নিরাশার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল।

এক সময় তার সব আশা-আকাঙ্খা মিলিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, রহিমকে মুক্ত করার জন্য রেজাউলের আবেদন

মঞ্জুর করে সে মহা ভুল করেছে। এটা যে একেবারেই অসম্ভব এক প্রচেষ্টা এটা জানার পরও সে কেমন করে রেজাউলের আবেদনে সাড়া দিল! এই ভুলের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো সে।

রাত ভোর হয়ে এল প্রায়। এখনি এখান থেকে সরে না পড়লে বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইমরানের অবচেতন মন তাকে যে কোন একটি ঘোড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ার জন্য তাগাদা দিতে লাগল। কিন্তু যখনি সে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিতে যায় তখনি রেজাউলের কথা মনে পড়ে যায় তার। রেজাউল বলেছিল, সে রাতে অবশ্যই আসবে। রহিমকে মুক্ত করতে না পারলে সে একা হলেও আসবে। তাই বেরোতে গিয়েও তার আর বেরোনো হয়ে উঠে না।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রেজাউল। কালো এক ছায়ামূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দী রহিমের কামরার জানালার পাশে। এই জানালার ওপাশেই আছে রহিম, হয়তো মাত্র কয়েক হাত দূরে সে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে। এই বন্দীশালা থেকে আদৌ কি তাকে মুক্ত করা সম্ভব হবে?

সে জানালায় কান লাগিয়ে ভেতরের কথা শুনতে চেষ্টা করলো। শুনতে পেল এক নারী কণ্ঠ বলছে, 'আমি তোমাকে মুক্ত করতে পারি, যদি তুমি অফিসারদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও। এ সব অফিসারদের ওপর আমার বাবার কি রকম প্রভাব তা তুমি ভাল করেই জানো। আমি কথা দিচ্ছি, আমার কথায়

রাজি হলে বাবাকে বলে আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করবো।'

রেজাউল আর অপেক্ষা করল না। রহিম এর কি জবাব দেয় তা জানারও চেষ্টা করল না। কথা যেন আর না এগোয় সে জন্য সে জানালায় সংকেতসূচক মৃদু আওয়াজ করল।

রহিম এই ইঙ্গিত বুঝতে পারলো। সে বুঝতে পারল, তাকে মুক্ত করার জন্য তার কোন সঙ্গী এসেছে। এ ইঙ্গিত রেজাউল বা ইমরান ছাড়া আর কারো জানা নেই। কিন্তু আলিসা এর কিছুই বুঝতে পারলো না।

রহিম থুতু ফেলার ভান করে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং জানালা খুলে বাইরে থুতু ফেললো।

রেজাউল জানালার নিচেই লুকিয়ে ছিল। রহিম যখন থুতু ফেলে জানালা আড়াল করে আবার আলিসার সামনে এসে দাঁড়ালো, পিছন থেকে জানালা টপকে সন্তর্পনে ভেতরে প্রবেশ করলো রেজাউল। তারপর কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই চোখের পলকে সে খঞ্জর হাতে আলিসার সামনে লাফিয়ে পড়ল এবং এক হাতে আলিসার মুখ কঠিনভাবে চেপে ধরে অন্য হাতে আলিসার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিল।

আলিসা চিৎকার করারও অবকাশ পেল না, তার আগেই সে লাশ হয়ে গেল এবং লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

রেজাউল ও রহিম জানালা দিয়ে লাফিয়ে বের হয়ে এল এবং অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

রেজাউল এখানকার অলিগলি, ছোট বড় সব রাস্তাই ভালমত চিনতো। সে পায়ে চলা অন্ধকার পথে রহিমের হাত ধরে ছুটতে শুরু করল পালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বারান্দার

প্রহরীর কানে আঘাত করল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

সে চকিতে লাফিয়ে উঠে ছুটল আওয়াজ লক্ষ্য করে। মোড় ঘুরেই দেখতে পেল দু'টি ছায়া অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

সে চিৎকার জুড়ে দিল, 'বন্দী পালিয়েছে! বন্দী পালিয়েছে! তোমরা কে কোথায় আছো জলদি ছুটে এসো।'

তার হাঁকডাকে অন্যসব প্রহরীরা সতর্ক হয়ে গেল। ঘুমন্ত প্রহরী ও সৈনিকদের অনেকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারদিক থেকে প্রহরীরা আওয়াজ করে জানিয়ে দিল সবাই সজাগ ও সতর্ক আছে।

রেজাউল ও রহিম ছুটা বন্ধ করে বাগান ও বৃক্ষের আড়াল নিয়ে অন্ধকারে সন্তর্পনে পথ চলছে। সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, তারপরই আবার বাগান শুরু হয়েছে।

সামনে ফাঁকা জায়গা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। রেজাউল বলল, 'এখানে বসে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবো আমরা। জানি, ফাঁকা জায়গাটুকু পার হওয়া বিপদজনক। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করা আরো বিপদের।'

'এ বিপদ আমাদের মাথায় নিতেই হবে। চলো চেষ্টা করি।' বলল রহিম।

ফাঁকা জায়গায় নেমে এল দু'জন। হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটি তীর ছুটে এসে রহিমের বুকের মধ্যে ঢুকে গেল।

রহিম ছিল যুবক ও সাহসী এক যোদ্ধা। বুকে তীর নিয়েই সে ছুটল রেজাউলের সাথে এবং ওপাশের বাগানের অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছল ওরা। তারপর আবার সন্তর্পনে ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলো না রহিম, কিছুদূর গিয়েই সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

রেজাউল ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করল তার বুক থেকে টেনে তীর বের করার। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না।

রহিম রেজাউলকে বললো, 'ভাই আমার! তুই পালিয়ে যা। আমার আশা ছেড়ে দে, আমাকে আর বাঁচাতে পারবি না। আমার জন্য তুই নিজের জীবন নষ্ট করিস না। মরার সময় এটুকু তৃপ্তি নিয়ে মরতে পারছি যে, আমার ভাইয়েরা ভ্রাতৃত্বের হক পুরোপুরিই আদায় করেছিল।' রহিম আর কথা বলতে পারছিল না। তার স্বর নিচু হয়ে এল, কণ্ঠ জড়িয়ে গেল।

রেজাউল কিছুক্ষণ বন্ধুর গায়ে হাত রেখে চুপচাপ বসে রইল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে গীর্জার দিকে পালিয়ে যেতে লাগলো।

পাহারাদারদের দৌড়াদৌড়ি ও শোরগোল তার কানে আসতে লাগলো। রাস্তা ছেড়ে সে বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। অনুসরণকারীরা প্রতিটি পথে শোরগোল করছিল আর তাদের খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু রেজাউলের ভাগ্য ভাল, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে সেনা অফিসারদের কোয়ার্টারের বাউণ্ডারি ওয়ালের কাছে পৌঁছে গেল।

এ দেয়ালের ওপাশেই মুসলমানদের একটা ছোট বস্তি। গীর্জায় পৌঁছতে হলে এ বস্তি পেরিয়ে আরো অন্ততঃ আধা কিলো যেতে হবে।

রেজাউল জানে, আক্রার মুসলমানরা কীট পতঙ্গের মত জীবন যাপন করছে। খৃস্টানদের চোখে প্রতিটি মুসলমানই

গোয়েন্দা ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি। নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের ওপর নেমে আসে প্রশাসনিক নির্যাতন। কারো ওপর সন্দেহ হলে সাথে সাথে তাকে বন্দী করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাদের বাড়ী তল্লাশীর নামে চালানো হয় খোলামেলা লুটপাট।

রেজাউল রহিমকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একটু দম নিল। নাড়ি পরীক্ষা করে দেখল এখনো তা ঠিক মতই কাজ করছে।

রহিমকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল রেজাউল। পোশাক খুলে সেই পোশাক পেঁচিয়ে পিঠের সাথে বাঁধল তাকে। তারপর দেয়াল টপকাল।

কোন মুসলমানকে বিপদে ফেলতে চাইল না সে। কিন্তু রহিমের বোঝা পিঠে পাথরের মত এমনভাবে চেপে বসেছে যে, সে আর হাঁটতে পারছে না। তবু বেপরোয়াভাবে সে এগিয়ে চলল। রহিমকে বাঁচিয়ে তোলার চিন্তা ছাড়া আর সব চিন্তা যেন তার মাথা থেকে গায়েব হয়ে গেছে।

আরো কিছুটা পথ এই অবস্থাতেই এগিয়ে গেল রেজাউল। কিন্তু পিঠের বোঝার চাপে তার হাটু মুড়ে এল। বসে পড়ল রেজাউল। গীর্জা পর্যন্ত পৌছার আশা ত্যাগ করল সে। বস্তির এক দরজায় আঘাত করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে ধরল বুড়োমত এক লোক। রেজাউল বুড়োর দিকে ফিরেও তাকাল না, আহত রহিমকে কাঁধে নিয়ে সরসর করে ঘরের ভেতরে চলে গেল। বুড়ো হা করে তাকিয়ে রইল এই ক্ষ্যাপা যুবকের দিকে। তার পিঠে ঝুলছে আরেক যুবকের রক্তাক্ত লাশ।

ভয় পেয়ে গেল বুড়ো। ওভাবেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রেজাউল পিঠ থেকে রহিমকে নামিয়ে বুড়ো লোকটাকে কাছে ডাকল। ভয়, আতঙ্ক আর নানা দুশ্চিন্তা নিয়ে এগিয়ে এল বুড়ো। রেজাউল সংক্ষিপ্ত কথায় তার কাছে তাদের পরিচয় দিল। তবে এত কথা বলার দরকার ছিল না। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, তারা মুসলমান।

রেজাউল রহিমের প্রতি খেয়াল দিল এবার। ততক্ষণে রহিম শহীদ হয়ে গেছে।

রেজাউলের কাপড়-চোপর সব রক্তে রঞ্জিত। ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল বাড়ীওয়ালা।

রেজাউল তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। ইমরানের কথাও বললো তার কাছে।

বুড়ো ছাড়াও বাড়ীতে ছিল তার দুই যুবক পুত্র। তাদের ঘর থেকে বুড়ো তাদেরকে ডেকে আনল। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনায় রেজাউল ও এই পরিবারের সবাই একাকার হয়ে গেল। তারা রেজাউলের কাপড়-চোপর বদলে দিল। সবাই মিলে পরামর্শ করে রহিমের লাশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিলো, তাকে ঘরের কোন কামরাতেই দাফন করা হবে।

দাফনের দায়িত্ব ওদের হাতে দিয়ে রেজাউল ছুটল ইমরান তার জন্য যেখানে অপেক্ষার প্রহর গুণছে সেই গীর্জার দিকে।

o

গভীর রাত।

সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ঘুমিয়ে আছে গভীর নিদ্রায়। জাতির গাদ্দাররা শত্রুর দেয়া শরাব ও নারী নিয়ে মাতাল হয়ে পড়ে

আছে। আর সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত, নির্বিকার।

তাদের থেকে দূরে, অনেক অনেক দূরে, ঈমানের বলে বলীয়ান এক মুসলিম যুবক ইসলামের সম্মান ও গৌরব রক্ষার জন্য নিজের জীবন বাজী রেখে প্রতীক্ষা করছে বন্ধুদের জন্য। ওরা এলেই আক্রা থেকে গোপনে বেরিয়ে যাবে সবাই। জীবন মরণ সংগ্রাম চালিয়ে ছুটে যাবে কায়রো। তাদের এ কায়রো পৌঁছার ওপর নির্ভর করছে মিশরের নিরাপত্তা। নির্ভর করছে মুসলিম বিশ্বের মান-সম্মান ও ইসলামের গৌরব।

তাদের কাছে রয়েছে এমন গোপন তথ্য, এমন পবিত্র আমানত, যার ওপর নির্ভর করছে সমগ্র জাতির ভাগ্য। অথচ তাদের আশেপাশে এমন কেউ নেই, যে তাদের সাহায্যকারী হতে পারে, যে তাদের ভালমন্দ দেখতে পারে। তাদের একমাত্র সহায় এখন আল্লাহ।

এমন সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চরম উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করছে ইমরান।

তার মাথায় কিলবিল করছে নানা চিন্তা, রহিম কি মুক্তি পাবে? রেজাউল কি আসতে পারবে? কায়রোয় এ খবর আদৌ কি পৌঁছানো যাবে? গেলে কখন?

মিশরের ওপর আঘাত হানার জন্য খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের বিরাট নৌবহর ভূমধ্য সাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে মিশরের উপকূলে আক্রমণ করতে ছুটে যাচ্ছে। এ খবর অনতিবিলম্বে কায়রো পৌঁছানো দরকার। এ জন্যই ইমরানের এত পেরেশানী।

ইমরান দ্রুত ক্রাক বা কায়রো পৌঁছতে চাচ্ছে, যেন এই

মুহূর্তে নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবী অন্য কোন সেক্টরে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে না বসেন। যদি তাদের এমন কোন সিদ্ধান্ত থাকেও, তা থামাতে হবে।

ইমরান এই দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তির জন্য সিজদায় পড়ে গেল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নফল নামাজ পড়তে শুরু করল সে।

এ সময় শহরে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলে প্রহরীদের হাকডাক কানে এল তার। সে নামাজ শেষ করে কান পাতলো। পাহারাদারদের ব্যস্ত তৎপরতা, দৌড়াদৌড়ি, সতর্কতা, এসব দেখে তার অশান্তি ও দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল।

সে আবার জায়নামাজে দাঁড়াল এবং দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলতে লাগলো, 'হে আল্লাহ, আমাকে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ ও ক্ষমতা দান করো। আমি যেন আমার সংগৃহীত তথ্য ঠিকানা মত পৌঁছে দিতে পারি এ তৌফিক দাও আমায়। এর বিনিময়ে তুমি আমাকে যা দান করেছো তার সব কিছু নিয়ে নাও। প্রয়োজনে আমার পরিবার, আমার খান্দানকেও আমি তোমার হাওলা করে দিচ্ছি। বিনিময়ে শুধু একটি সুযোগ চাই, আমি যেন এ তথ্য তোমার খাদেমদের দরবারে পৌঁছে দিতে পারি।'

ইমরান চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মালিকের দরবারে তার প্রার্থনা তখনো শেষ করেনি, হঠাৎ দরজার উপরে সাংকেতিক টোকা পড়ল, যেমন পড়েছিল রহিমের জানালায়। ইমরান তাড়াতাড়ি মোনাজাত শেষ করে দরজা খুলে দিল।

রেজাউল দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। তাকে ভেতরে

ডেকে এনে দরজা বন্ধ করে দিল ইমরান। রেজাউল তখন ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল।

সে ইমরানকে বললো, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে ইমরান। আমাদের ওপর দিয়ে মহা বিপদ বয়ে গেছে। রহিম শহীদ হয়ে গেছে।'

ইমরানের কাছে সব ঘটনা খুলে বলল রেজাউল।

ইমরান যখন শুনলো রহিমের লাশ একজন মুসলমানের বাড়িতে তাদের ঘরের মেঝেতে দাফন করার জন্য রেখে এসেছে রেজাউল, তখন ভীত শংকিত কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'একি করেছো তুমি! তাদের ওপর এখন বিপদের কি জাহান্নাম নেমে আসবে কল্পনা করতে পারো? আমরা কোনদিন আক্রার কোন মুসলমানের বিপদের কারণ হবো, এমনটি আমি কল্পনাও করিনি রেজাউল!'

রেজাউল অভয় দিয়ে তাকে বললো, 'ওই পরিবারে তিনজন পুরুষ ও কয়েকজন নারী আছে। এ কাজের জন্য বাইরের কাউকে ডাকতে হবে না তাদের। তারা তখুনি কামরার এক কোণে গর্ত খোড়া শুরু করে দিয়েছে। হয়তো এতক্ষণে তারা লাশ দাফনও করে ফেলেছে। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এ খবর তারা বাইরে কাউকে জানাবে না।'

ইমরান সে বাড়িতে যেতে চাইলো। বলল, 'তাদের গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা আমি দেখতে চাই।'

রেজাউল তাকে আশ্বস্ত করলো, 'তারা খুব সতর্ক লোক মনে হলো। আমার বিশ্বাস তারা সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারবে।'

৩

আক্রা থেকে বের হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে গেল।

সৈন্যদের অফিসার্স কোয়ার্টারে সেনাবাহিনীরই এক অফিসারের বাগদত্তা এবং শহরের নামকরা ব্যবসায়ীর একমাত্র যুবতী কন্যার খুন হয়ে যাওয়া এবং একজন গোয়েন্দার পলায়ন, কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। এ নিয়ে শহরে এক তুলকালাম বেঁধে গেল। সারা শহরে সাধারণ প্রহরীদের সাথে পুলিশ এবং সেনা সদস্যরাও পাহারা ও তল্লাশীতে নেমে পড়ল।

ইমরান বলল, 'পাহারা যত জোরদারই হোক, যত বড় বিপদই থাক মাথার ওপর, এরই মধ্যে রাস্তায় নামতে হবে আমাদের এবং এখুনি।'

'তাহলে আমরা দু'জন আলাদাভাবে যাত্রা করি, যাতে একজন ধরা পড়লে আরেকজন অন্তত মুক্ত থাকতে পারি।'

ইমরান বলল, 'না, আমরা একত্রেই বের হবো। যদি কেউ ধরা পড়ি বা দু'জনেই ধরা পড়ি, তবে কিছুতেই গোপন তথ্য প্রকাশ করবো না। রহিমের লাশ কোথায় আছে এবং সে যে মারা গেছে, এ কথাও প্রকাশ করবো না।'

'কিন্তু ঘোড়ার কি ব্যবস্থা করেছো?' জানতে চাইল রেজাউল।

ইমরান রেজাউলকে সেই স্থানে নিয়ে চলল, যেখানে আটটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। কিন্তু দূর থেকেই দেখা গেল, সেখানে একজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে।

ইমরান রেজাউলকে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে একাই আগে বাড়ল। প্রহরীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি

ব্যাপার! হঠাৎ করে আজ এদিকে পাহারার ব্যবস্থা!'

প্রহরী ইমরানকে জন গিস্থার নামে চিনতো এবং বড় পাদ্রীর বিশেষ খাদেম হিসেবে তাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করতো। সে ইমরানকে বললো, 'আজ রাতে শহরে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। বিকেলে একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল। তাকে জেরা করার জন্য রাখা হয়েছিল অফিসার্স কোয়ার্টারে। রাতে সে একটি মেয়েকে খুন করে পালিয়ে গেছে। সারা শহরে তন্ন তন্ন করে তাকে খোঁজা হচ্ছে। তাই সর্বত্র এত সতর্কতা।'

এই প্রহরীর সামনে ঘোড়া খোলা সম্ভব ছিল না। ইমরান তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। রেজাউল খুক করে একটু কাশল, প্রহরী কে কাশে দেখার জন্য যেই পিছন ফিরেছে অমনি তার গলা এমন শক্ত ভাবে চেপে ধরলো ইমরান, সে আর শব্দ করতে পারলো না।

রেজাউল ছুটে এসে তার খঞ্জর প্রহরীর বুকে বসিয়ে দিল। মৃত্যু পর্যন্ত ইমরান প্রহরীর গলা শক্ত করে ধরেই রাখলো।

ইমরান নিহত প্রহরীর লাশ রেখে ছুটল ঘোড়ার উদ্দেশ্যে। রেজাউলও ছুটল তার পিছু পিছু। দ্রুত দুই ঘোড়ার পিঠে জ্বীন এঁটে লাফিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল দু'জন।

গির্জার সমস্ত লোক তখনো গভীর ঘুমে। ইমরান ও রেজাউল শহর থেকে বের হওয়ার নিরিবিলি ও নির্জন এক অন্ধকার গলি পথে টহল দেয়ার ভঙ্গিতে ঘোড়া চালিয়ে বেরিয়ে এল শহর থেকে। শহরের শেষ মাথায় এসে হঠাৎ তারা

একদল পাহারাদারের সামনে পড়ে গেল। ইমরান ওদের দেখেই দূর থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'কোন খবর পেলে? বজ্জাতটার কোন হদিস পেলে?'

তিন-চারটি মশাল দ্রুত এগিয়ে এলো ওদের দিকে। একজন বলে উঠল, 'তোমরা কারা?'

'আমরা কমাণ্ডো ইউনিটের। আসামী এদিকে আসেনি?'

'কিন্তু তোমাদের ড্রেস কোথায়?'

'আহাম্মক, এখন কি ড্রেস খোঁজার সময়? তোমরা এদিকে ড্রেস পরার তালে থাকো, ততক্ষণে আসামী পগাড়পার হোক উজবুক কোথাকার।' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'চলো।'

পাহারাদারদের মশালগুলোকে পাশ কাটিয়ে ওরা সামনে বাড়তে চাইলো। দেখলো, অদূরে একদল অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরো কয়েকজন। এতেই তারা বুঝতে পারলো, সারা শহরে কেমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইমরান তার কাপড়ের দিকে লক্ষ্য করেনি। তার কাপড়ে নিহত সেন্ট্রীর রক্ত লেগে ছিল। মশালের আলোতে এক অশ্বারোহীর চোখে পড়ল সে রক্ত। সে দ্রুত তাদের পথ আগলে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কাপড়ে রক্ত কিসের?'

মুহূর্তের মধ্যে ইমরান বুঝে ফেললো তারা ধরা পড়তে যাচ্ছে। সে দ্রুত ঘোড়ার লাগাম টেনে তীর বেগে ঘোড়া ছুটালো। রেজাউলও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিন্তু পলকে এক অশ্বারোহী তার পথ আগলে দিল। পাশেই দাঁড়ানো অশ্বারোহীরা ছুটে এসে ঘিরে ফেললো তাকে।

ইমরান বেরিয়ে যেতে পারলেও রেজাউল তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন অশ্বারোহী ইমরানের পিছু ধাওয়া করলো। সে রেজাউলের উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল, 'ইমরান, তুমি পালাও। খবরদার পিছনে তাকাবে না, থামবে না কোথাও। আল্লাহ্ হাফেজ!'

ইমরানের কানে বহু দূর পর্যন্ত এই শব্দ বাজতে থাকল। এক সময় মনে হলো, সে অবরোধ মুক্ত হতে পেরেছে।

ইমরানের ঘোড়া ছিল খুবই তাজাদম, বুদ্ধিমান এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। এখানকার রাস্তাঘাটও ছিল তার পূর্ণ নখদর্পনে। সে তার আরোহীর বিপদ টের পেয়ে পিছু ধাওয়াকারীদের দ্রুত পিছনে ফেলে তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তার ডান ও বা পাশ দিয়ে অসংখ্য তীর শাঁ শাঁ করে ছুটে গেলো, ভাগ্যগুণে তার একটিও আরোহী বা ঘোড়ার গায়ে লাগেনি।

ঘোড়া ইমরানকে নিয়ে ক্রাকের দিকে ছুটে চললো। ধাওয়াকারীরা এখন কত দূরে, কোথায়, বুঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু ঘোড়া তার গতি কমালো না। তার সারা শরীর ঘামে জবজব করছে। তারও অনেক পরে ইমরান উপলব্ধি করলো ঘোড়ার গতি আস্তে আস্তে কমে আসছে। তার মনে হলো, এবার ঘোড়া বদলানো প্রয়োজন। আর বেশীক্ষণ সে চলতে পারবে বলে মনে হয় না।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। যখন চারদিক একদম ফকফকা ফর্সা হয়ে গেল, তখন আর ঘোড়ার চলার অবস্থা

রইলো না।

সে পানির সন্ধান করলো, কিন্তু আশেপাশে পানির কোন উৎসই তার নজরে এলো না। সামনে উঁচু বালির পাহাড়। ক্লান্ত ঘোড়া এ পাহাড় কিভাবে অতিক্রম করবে ভাবছিল ইমরান, হঠাৎ তার সামনে দুটি তীর এসে পড়লো। তাতে সংকেত ছিল, 'থেমে যাও'। সে থেমে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সামনে এসে উপস্থিত হলো একদল লোক। তাদের দেখে তার বুকে জান ফিরে এলো। সে দেখলো, যারা তার গতিরোধ করেছে তারা সবাই নিজেদের লোক।

তাকে সঙ্গে সঙ্গে কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। কমাণ্ডার তার কথা শুনে বললেন, 'এখন কি করতে চাও?'

ইমরান বললো, 'প্রথমে ক্রাকে গিয়ে সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে দেখা করে আক্রার অবস্থা তাঁকে অবগত করাবো, পরে কায়রোতে গিয়ে সুলতান সালাহউদ্দিনকে জানাবো।'

তার কথা শুনে কমাণ্ডার তাকে সতেজ ঘোড়া এবং সঙ্গে আরও দু'জন সৈনিক দিয়ে ক্রাকের পথে যাত্রা করিয়ে দিলেন।

o

ইমরান যখন ক্রাকের কেল্লায় বসে সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর সামনে তাদের অভিযানের বিবরণ পেশ করছিল এবং অভিযানের শেষলগ্নের করুণ ঘটনাবলী বর্ণনা করছিল, নূরুদ্দিন জঙ্গী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন সেই অভাবিত কাহিনী। তাঁর চেহারায় খেলা করছিল মুগ্ধতার আবেশ। তিনি এমনভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন যেন অন্তরের অন্তস্থলে খোদাই

করে নিচ্ছেন এক সুন্দর যুবকের ছবি।

ইমরানের বলা শেষ হলে তিনি উঠে অধীরভাবে ইমরানকে বুকে চেপে ধরলেন এবং তার দুই গালে চুমু খেলেন। তারপর নিজের তালোয়ার খাপমুক্ত করে তলোয়ারে চুম্বন করলেন। এরপর তলোয়ারটি দুই হাতে ধারণ করে ইমরানের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, 'বর্তমানে ক্রুসেডাররা যখন ভয়ঙ্কর শকুনের মত চাঁদের সুষমা ঢেকে দিতে চাচ্ছে তখন এক মুসলমান ভাই অপর ভাইকে তলোয়ার ছাড়া আর কি উপহার দিতে পারে?

তুমি বাগদাদে বলো, দামেস্কে বলো, আর যেখানেই বলো না কেন, তোমাকে আমি এর যে কোন স্থানে একটি মহল দিতে পারি। তুমি যে সাহসিকতা দেখিয়েছে তার বিনিময়ে তোমাকে অর্থ সম্পদের আশ্বাস দান করা যায়! কিন্তু হে বন্ধু! আমি তোমার জন্য কোন মহল তৈরী করবো না, উপহার দিব না। আর অর্থের মাপে কোন বিনিময়ও দেবো না। কারণ এই অর্থই অনর্থের মূল। যে জিনিস মুসলমানকে অন্ধ ও অকর্মণ্য করে দেয়। তারচে তুমি এই তলোয়ার গ্রহণ করো! এটা আমার তলোয়ার! আর মনে রেখো, এই তলোয়ার খৃস্টানদের অনেক মহারথি জালিমের রক্ত পান করেছে। এই তলোয়ার বহু কেল্লার উপরে ইসলামী পতাকা উড্ডিন করেছে। এই তলোয়ার ইসলামের অতন্ত্র প্রহরী।

ইমরান নূরুদ্দিন জঙ্গীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তাঁর হাত থেকে তলোয়ারটি গ্রহণ করে চুমু খেল। তারপর তা চোখে গালে স্পর্শ করলো গভীর আবেগ ও তৃপ্তি নিয়ে। শেষে

তলোয়ারটি কোমরে ধারণ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। সে 'ধন্যবাদ' জাতীয় কিছু বলতে চাইল কিন্তু আবেগে তার গলা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই সে কিছুই বলতে পারলো না। কোন রকমে হাতের পাতা দিয়ে দু'চোখের আনন্দাশ্রু মুছে চোখ তুলে তাকালো নূরুদ্দিন জঙ্গীর দিকে।

'আর তুমি তোমার নিজের মূল্য বুঝে নাও বন্ধু!' জঙ্গী বললেন, 'একজন গোয়েন্দা শত্রু সেনাদের পরাজিত করতে পারে, আর একজন গাদ্দার তার জাতিকে পরাজিত ও ঘৃণিত করতে পারে। তুমি শত্রুদের পরাজিত করে এসেছো; কারণ তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছো এ খবরই হবে শত্রুদের পরাজয়ের কারণ। ক্রুসেড বাহিনী ইনশাআল্লাহ ফিলিস্তিন ও মিশরের সাগর তীরে ঠাঁই করতে পারবে না। আর তাদের সামুদ্রিক নৌবহরও ফিরে যেতে পারবে না। এ বিজয় তোমাদেরই বিজয়। আর তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতের সাফল্য দান করবেন।'

'আমার জলদি কায়রো পৌঁছা দরকার।' ইমরান বললো, 'কারণ সময় বেশী নেই। মিশরের গভর্ণরকে আরো আগেই সংবাদ জানানো উচিৎ ছিল।'

'তুমি এখুনি যাত্রা করো।' নূরুদ্দিন জঙ্গী বললেন, 'আমি তোমাকে ভাল জাতের ঘোড়া দিচ্ছি।'

তিনি ইমরানকে কায়রো যাওয়ার নিরাপদ ও সহজ রাস্তা বাতলে দিলেন। বললেন, 'এ রাস্তায় কয়েক জায়গায় সেনা চৌকি আছে। সেসব চৌকিতে সংবাদ বাহকদের জন্য বিশ্রাম এবং ঘোড়ার ব্যবস্থাও করা আছে।'

ইমরান যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি বললেন, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বলবে, রেজাউল ও রহিমের পরিবারকে তিনি যেন নিজের পরিবার মনে করেন। তাদের ভরণ-পোষণ ও তত্ত্বাবধান করেন। তাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য বায়তুলমাল থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা নেন।'

'জ্বী, বলবো।' ইমরান আদবের সাথে জওয়াব দিল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি শুধু গোয়েন্দাগিরিই করো, না যুদ্ধ করার ট্রেনিংও পেয়েছো?'

'জ্বী, পেয়েছি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আপনার কোন আদেশ থাকলে বলুন।' বললো ইমরান।

'চিঠি লেখার তো সময় নেই!' জঙ্গী বললেন, 'সালাহউদ্দিনকে বলবে, ক্রাক দূর্গটি তার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে আমার তাড়াতাড়ি দামেস্কে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে থেকে সংবাদ এসেছে, সেখানে খ্রীস্টান দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা বেড়ে গেছে। আর আমাদের ছোট ছোট রাজ্যের শাসকগণ তাদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে গেছে।

কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি যে তথ্য পেলাম তাতে আমার সে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হচ্ছি। চার-পাঁচ বছর আগে সালাহউদ্দিন যে ক্রুসেডারদের নৌবহরকে ফাঁদে ফেলে রোম সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবার সে ফাঁদে তারা পা দেবে না। এখন তারা সাবধান হয়ে গেছে। সে কারণেই তারা আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর সমুদ্রতীর বেছে নিয়েছে। যদি আইয়ুবী আলেকজান্দ্রিয়ায় সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে ভুল করবে। কারণ তার কাছে ক্রুসেডারদের মত শক্তিশালী নৌশক্তি নেই।

তাদের জাহাজ বড় আর প্রতিটি জাহাজে পাল ছাড়াও অসংখ্য দাঁড় ও বৈঠা আছে। সেই দাঁড় টানার মত তাদের কাছে রয়েছে অসংখ্য গোলাম। আইয়ুবীর তা নেই।

তার জাহাজে দাঁড় টানার মত মাল্লা আছে, সৈন্যও আছে। কিন্তু সামুদ্রিক যুদ্ধে তারা দু'দিকে সামাল দিতে পারবে না। সে জন্য আইয়ুবীকে বলবে, খৃস্টান বাহিনীকে তীরে নামার সুযোগ দিতে। এতে করে আলেকজান্দ্রিয়ার জনসাধারণ ভয় ও আতংকের মধ্যে পড়ে যাবে। কারণ ওরা তীরে নেমেই অগ্নিগোলা ছুঁড়ে শহরে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। আইয়ুবীকে এ ব্যাপারেও সতর্ক করে দেবে।

যদি শত্রুরা তুমি যেমন সংবাদ নিয়ে এসেছো সেভাবেই আক্রমণ চালায় তবে আমি শত্রু সেনাদের পাশ থেকে আক্রমণ চালাবো। তারা আমার আক্রমণের বাম পাশে থাকবে। সালাহউদ্দিনকে বলবে ডান পাশ থেকে আক্রমণ চালাতে। আর তার দায়িত্ব থাকবে, যেন তাদের একটি জাহাজও ফিরে যেতে না পারে। আগুন লাগিয়ে পুড়ে ছাই করে দিতে হবে সব জাহাজ। তার কাছে যে প্রশিক্ষিত কমাণ্ডো বাহিনী আছে তারা ভাল করেই জানে কিভাবে তা করতে হবে।

আরেকটি কথা, তাকে সুদানীদের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের সীমান্ত যেন খোলা না থাকে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সুসজ্জিত ও সতর্ক থাকতে বলবে। আমি জানি, তার কাছে যে সৈন্য আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। আমি সে ঘাটতি পূরণ করতে চেষ্টা করবো। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গোপন তথ্য জানা ও তার আদান প্রদান।

গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরেই লিখিত চিঠি পাঠালাম না। বিজয় লাভের পর আমি ক্রাকের শাসন ক্ষমতা সৈন্যদের হাতে দিয়ে দামেস্কে চলে যাব।'

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর প্রতিটি কথা ভালমত অন্তরে গেঁথে নিয়ে ইমরান কায়রোর দিকে যাত্রা করলো।

খৃষ্টীয় ১১৭৩ সাল। আলী বিন সুফিয়ান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে সংবাদ জানালেন, 'আক্রাতে একজন মুসলিম গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, আরেকজন ধরা পড়েছে আর তাদের কমাণ্ডার ইমরান ফিরে এসেছে।'

সুলতান আইয়ুবী এ খবর শুনে বিষণ্ন হয়ে গেলেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁকে জানালেন, 'ইমরান খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছে।'

এতেও সুলতানের বিষণ্নতা দূর হলো না। তিনি আলী বিন সুফিয়ানের সাথে সংক্ষেপে কথা সেরে ইমরানকে ভেতরে ডেকে নিলেন। ইমরান ভেতরে প্রবেশ করতেই সুলতান উঠে এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

'আগে বলো, তোমার সঙ্গী কেমন করে শহীদ হলো, আর দ্বিতীয়জন কেমন করে ধরা পড়লো?'

ইমরান সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। যখন সে আক্রার সামরিক বিভাগের গোপন সিদ্ধান্ত ও তথ্য বর্ণনা শুরু করলো, সুলতান আইয়ুবীর চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। ইমরান বললো, আমি ক্রাকে নূরুদ্দিন জঙ্গীকে এ সংবাদ জানিয়ে এসেছি।

সুলতান বললেন, 'তিনি কেমন আছেন?'

'জ্বী, তিনি ভাল আছেন। আপনার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছেন।'

'কই সে বার্তা? দাও।' উদগ্রীব হয়ে বললেন আইয়ুবী।

'না, তিনি কোন লিখিত বার্তা পাঠানো ঠিক মনে করেননি, যা বলার সব আমাকে বলেছেন, আর বলেছেন, আমি যেন তা ঠিক মত আপনাকে জানাই।'

ইমরান সুলতান আইয়ুবীকে নূরুদ্দিন জঙ্গীর বার্তা শোনালো। তাতে সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ প্ল্যানের অনেক সময় বেঁচে গেল। তিনি প্রথমেই রহিম ও রেজাউলের পরিবারের ভাতা নির্ধারণ করলেন। তাদের জানালেন, তারা যেন যে কোন অভাব অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে সুলতানকে জানায়। তিনি তাদের শান্তনা দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে তোমাদের অভিভাবক আমি। তোমাদের যে কোন সুবিধা অসুবিধার কথা অন্যে জানার আগে যেন আমি জানতে পারি।'

তিনি ইমরানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। সুলতানের প্রশ্নের জবাবে ইমরান বললো, 'চার পাঁচ বছর আগের তুলনায় ক্রুসেডারদের নৌবহর আরো বেড়েছে। তাদের যুদ্ধ জাহাজও এখন অনেক বেশী।'

'আক্রমণের কোন দিন তারিখ কি তারা নির্ধারণ করেছে?'

'আক্রমণ এক মাসের মধ্যেই হবে। ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ নতুন সৈন্য আমদানি করা হয়েছে। ওদেরকে আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর সমুদ্রতীরে নামানো হবে। দ্বিতীয় বাহিনী বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মিশরের দিকে অগ্রসর হবে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণকারী বাহিনী সে স্থান দখল করে সেখানে তাদের ঘাঁটি ও রসদপত্রের কেন্দ্র বানাবে। তারপর তারা উত্তর দিক থেকে মিশরে আক্রমণ চালাবে।'

ইমরানের বর্ণনা শুনে সুলতান আইয়ুবী খৃস্টান বাহিনীর কৌশল যথার্থই আঁচ করতে পারলেন। তারা আক্রমণের এমন পরিকল্পনা করেছে যাতে সুলতান আইয়ুবী আক্রমণের আগে কিছুই টের না পান। তাছাড়া আক্রান্ত অবস্থায় নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাক থেকে তাকে যেন কোন সাহায্য পাঠাতে না পারেন সে জন্যই বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বাহিনী পাঠাচ্ছে। এ বাহিনী পথেই জঙ্গীর বাহিনী এগিয়ে এলে বাঁধা দিতে পারবে। ফলে বিপুল বাহিনী ও আধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলায় আইয়ুবীর পতন যে নিশ্চিত এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয় খৃস্টানদের।

সুলতান আইয়ুবী অনুভব করলেন, এ এমন এক তুফান, যদি তারা সুলতানের অজ্ঞাতে এসেই যেতো, তবে মিশর খৃস্টানদের দখলে যেতো।

সুলতান তখুনি সেনাবাহিনীর সিনিয়র সেনাপতিদের জরুরী অধিবেশন ডাকলেন। আলী বিন সুফিয়ানকে নির্দেশ দিলেন, 'শত্রুর গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি দাও। চারদিকে চোখ-কান খোলা রাখো। সব ব্যাপারেই সাবধানতা অবলম্বন করবে, সতর্ক থাকবে যেন নিজের সেনাবাহিনীর কোন খবরই বাইরে শত্রুদের কাছে যেতে না পারে।'

তিনি আলীকে আরো বললেন, 'আলেকজান্দ্রিয়ার দিকেও বিশেষ নজর রেখো।'

০

খৃস্টান মহলে যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলছে। বৃটেন এখনো এ যুদ্ধে অংশ নিতে রাজী হয়নি। ইংরেজদের আশা, তারা কোন এক সময় একাই মুসলমানদের পরাজিত করে তাদের অঞ্চলগুলো অধিকার করে নেবে। সম্মিলিত আক্রমণের ব্যাপারে তাই তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পোপের অনুরোধে ইংরেজরা ক্রুসেড বাহিনীতে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ দান করল।

স্পেনের সমস্ত জাহাজ এ যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত হল। সবার আগে এগিয়ে এল ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামের যুদ্ধ জাহাজ। এরপরই সম্মিলিত নৌবাহিনীতে শরীক হলো গ্রীস ও সিসিলির রণতরী। রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য বড় বড় জেলে নৌকা সঙ্গে নিল ওরা।

এ নৌবহরে ইউরোপের প্রতিটি দেশের চৌকস সৈন্যদের শামিল করা হলো। যুদ্ধ যাত্রার আগে পবিত্র ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করানো হলো তাদের। সকলেই শপথ করলো, 'বিজয় লাভ করতে না পারলে আর কোনদিন স্বদেশে ফিরবো না। একমাত্র মরণ ছাড়া আর কোনকিছু আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারবে না। সুলতান আইয়ুবী যদি তার যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে আমাদের মোকাবেলা করতে চায় তবে আমাদের হাতে মিশর তুলে দেয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না।'

ফ্রান্সের এডমিরাল বললেন, 'আমি জানি তাদের নৌবহর কত ছোট আর দুর্বল।' তিনি ভূমধ্য সাগরের পারে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, 'সালাহউদ্দিন ও নূরুদ্দিন জঙ্গী শুধু স্থলে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত।

যদি আমাদের এ আক্রমণের সংবাদ মুসলমানদের কানে সময়ের আগে না পৌঁছে তবে কারো বাপেরও সাধ্য নেই আমাদের মোকাবেলা করে। আর সালাহউদ্দিন তখনই এ আক্রমণের খবর পাবে, যখন আমরা তার ঘাড়ের ওপর গযবের মত আপতিত হবো। তখন মিশর থাকবে আমাদের অবরোধের আওতায়। আর নূরুদ্দিন জঙ্গী শত ইচ্ছা থাকলেও তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না, কারণ তাকে পথেই বাঁধা দেয়ার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আমাদের বাহিনী রওনা হয়ে গেছে। এবার আমাদের আক্রমণ হবে একতরফা, বিজয়ও হবে একতরফা।'

রিনাল্ট একজন প্রসিদ্ধ খৃস্টান শাসক ও বীর যোদ্ধা। তিনি বললেন, 'আমি আবারও বলছি, সুদানীদের এ লড়াইয়ে ব্যবহার করা দরকার।'

বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে স্থল পথে এগিয়ে আসা বাহিনীর সাথে তার থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি শুরু থেকেই জিদ ধরেছিলেন, মিশরের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণকারী বাহিনীর সাথে থাকার জন্য। তার কথা হলো, 'এই সুযোগে সুদানীরা মিশরের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করুক।'

'আপনি অতীতের শিক্ষা ভুলে গেছেন!' ইসলামের সবচে বড় শত্রু ফিলিপ আগাস্টাস বললেন, '১১৬৯ সালে আমি সুদানীদের পর্যাপ্ত সাহায্য দিয়েছিলাম। ভরসা ছিল, আমরা যখন সাগর পথে মিশরে আক্রমণ চালাবো তখন সুদানীরা দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। আর সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদলে যে সব সুদানী রয়েছে তারা বিদ্রোহ করবে। কিন্তু তখন তারা

কিছুই করেনি। দু'বৎসর পর তাদের আবার সাহায্য দেয়া হলো, তাও বিফলে গেল। এখনও তারা আমাদের নিরাশ করবে। কেন আমরা তাদেরকে আমাদের পরিকল্পনায় শামিল করবো?'

'মিশর আমরা আমাদের শক্তিতে অধিকার করলেও, সুদানীরা আমাদের কাছে অংশ দাবী করবে।'

'আপনি ভুল করছেন। সুদানীদের মধ্যে মুসলমান কম নেই। আর মুসলমানদের উপরে ভরসা করা মহা ভুল। আপনি যদি ইসলামের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে চান তবে কোন মুসলমানকেই অন্তর থেকে বন্ধু মনে করবেন না। তাদেরকে প্রলোভন দিয়ে অনুগত দাস বানাবেন কিন্তু অন্তরে তাদের জন্য সারাক্ষণ শত্রুতা পোষণ করবেন।'

'আপনি সত্য কথাই বলেছেন।' এক খৃস্টান রাজা বললেন, 'আমরা ফাতেমীদের বন্ধু বানিয়েছিলাম। তারা সালাহউদ্দিনের শত্রু হয়েও তাকে হত্যা করলো না। আমরা তাদেরকে বড় বড় গোয়েন্দা এবং সাহসী যোদ্ধা দিয়েও সাহায্য করেছিলাম। অথচ তারা তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে হত্যা করালো। তাহলে আমরা কার উপর ভরসা করবো?'

'এখন আমাদের নিজস্ব সামরিক শক্তির উপরই ভরসা করতে হবে, তা হলেই আমরা সফল হবো।'

এ যুদ্ধে খৃস্টানদের সামরিক শক্তি অহংকার করার মতই ছিল, এবং তাদের মধ্যে এ অহংকার যথেষ্ট প্রকটও ছিল। সামুদ্রিক যুদ্ধে নৌ শক্তির কোন হিসাব ছিল না। বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে যে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছিল,

তারা ছিল নৌবাহিনীর দ্বিগুণেরও বেশী।

এ নৌযুদ্ধে খৃস্টানদের ছ'জন সম্রাট সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসকরাও সেনাবাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে চলে এসেছিলেন ময়দানে। তাদের একটিই ত্রুটি ছিল, সম্মিলিত বাহিনীর কোন ঐক্যবদ্ধ একক কমাণ্ড ছিল না। তাদের ঐক্যবদ্ধ একক কমাণ্ড থাকলে নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীকে তারা সহজেই পরাস্ত করতে পারতো বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

সুলতান আইয়ুবীর সামনে সমস্যা ছিল তিনটি। তার সৈন্য সংখ্যা কম। মিশরে গাদ্দাররা অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রেখেছে। সুদানীরা সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালাতে পারে।

নূরুদ্দিন জঙ্গীরও কিছু অসুবিধা ছিল। ইসলামী জগত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ সকল রাজ্যের আমীররা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। খৃস্টানরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে একরকম অধীনই বানিয়ে রেখেছিল। খৃস্টানদের কূটচক্রান্তে পড়ে তারা পরস্পর শত্রু হয়ে উঠেছিল এবং নিজেদের মধ্যে সংঘাত শুরু করে দিয়েছিল। ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করার অনুভূতিও তারা হারিয়ে ফেলেছিল। এসব সমস্যা নিয়েই খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তারা।

সুলতান আইয়ুবী সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। এক দলকে সুদানের সীমান্তে চলে যেতে বললেন। তার কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিলেন, 'সীমান্ত থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় এতটা দূরত্বে তাবু টানিয়ে ক্যাম্প করবে। কিন্তু

পুরো সীমান্ত এলাকায় সৈন্যদেরকে এমন ভাবে কর্মতৎপর ও ব্যতিব্যস্ত রাখবে যেন সব সময় বাতাসে অশ্ব ক্ষুরের ধূলি উড়তে দেখা যায়। যাতে মনে হয়, সীমান্তে অসংখ্য সৈন্য মোতায়েন রয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন যেন তারা কোন অবস্থাতেই অসতর্ক অবস্থায় না থাকে।

দ্বিতীয় দলকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাদের নির্দেশ দিলেন, 'দিনের বেলায় যুদ্ধ যাত্রা করবে না। রাতের আঁধারে পথ চলবে, আর দিনে গোপন স্থানে ক্যাম্প করে বিশ্রামে থাকবে।'

তাদের কমাণ্ডারকে আরো বললেন, 'আলেকজান্দ্রিয়ায় তোমাদের শিবির ও যুদ্ধ ক্যাম্প কোথায় হবে সে নির্দেশ পরে জানানো হবে।'

তৃতীয় দলটিকে সুলতান আইয়ুবী নিজের কমাণ্ডে রাখলেন। কিন্তু কেন এই প্রস্তুতি ও ব্যস্ততা তা কাউকে বললেন না। উর্ধতন অফিসারদের শুধু বললেন, 'বিশেষ প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে জরুরীভাবে কিছু কাজ দেয়া হচ্ছে। যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে এবং যেভাবে চলতে বলা হচ্ছে, আমি চাই সে তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করুক।'

সুলতানের এ নির্দেশের পর সৈন্যরা এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন তোলেনি। তবে সবাই এ দেখে বেশ অবাক হলো, সমস্ত মিনজানিক ও ভারী অস্ত্রগুলো আলেকজান্দ্রিয়াগামী সৈন্য দলকে সাথে নেয়ার জন্য দিয়ে দিলেন।

এ নির্দেশের সাত আট দিন পর সুলতান আইয়ুবীকে আর

কায়রোতে দেখা গেল না, আর নূরুদ্দিন জঙ্গীও ক্রাকে ছিলেন না। তাঁরা দু'জনই আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্ব দিকে নিজ নিজ গোপন আস্তানায় অবস্থান করছিলেন। মাঝে মধ্যে আস্তানা থেকে বেরিয়ে তারা পুরো এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াতেন। কিন্তু তখন তারা থাকতেন ছদ্মবেশে। ফলে কেউ তাদের চিনতে পারতো না। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও কেউ বলতে পারতো না, এ ব্যক্তিই একটি দেশের শাসক ও সেনা বিভাগের প্রধান!

জনসাধারণ এ দুই মহান ব্যক্তিকেও তাদের মতই সাধারণ মানুষ মনে করতো। অথচ এ দুই ব্যক্তি ছিল ক্রুসেড বা খৃস্টান জগতের জন্য ভয়ংকর ভয় ও আতংকের কারণ। তাঁরা দু'জনই সাধারণ গরীব উষ্ট্র চালকের বেশে ছিলেন। কেউ তাদের ব্যাপারে এই আগ্রহও প্রকাশ করলো না যে, এই উষ্ট্রচালকরা কোত্থেকে এসেছে আর কোথায় যাচ্ছে।

তাঁরা দু'জনই সাগর তীরে গিয়ে রোম সাগরের সুদূর বিস্তৃত জলরাশি অবলোকন করতেন আর অনুসন্ধান করতেন কোথাও কোন রণতরী দেখা যায় কিনা।

তাঁরা তিন চার দিন ধরে দূর দূরান্ত পর্যন্ত ঘুরে ফিরে বেড়ালেন। শেষে সুলতান আইয়ুবীকে আলেকজান্দ্রিয়াতে রেখে নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাকে চলে গেলেন। সুলতান আইয়ুবীও তার কয়েকদিন পর সেনাবাহিনীকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে চলে গেলেন কায়রো।

o

খৃস্টানদের নৌবহর অশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে সম্পূর্ণ নিরবে এগিয়ে চললো। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে স্থল

বাহিনীও অনুরূপ গোপনীয়তা রক্ষা করে সামনে বাড়লো। দুই বাহিনীর যাত্রার সময়ের মধ্যে কিছু হেরফের ছিল প্রয়োজনের তাগিদেই। খৃস্টানরা সুবিধা মত তাদের জন্য অনুকূল মৌসুম বেছে নিয়েছিল। এ মৌসুমে রোম সাগর অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে, বিশেষ করে সাগরে তুফান ও সমুদ্র ঝড়ের আশংকা থাকে না।

খৃস্টান নৌবাহিনীর চোখের সামনে মিশরের সমুদ্র তীর ভেসে উঠল। কিন্তু তাদের চোখের সামনে সুলতান আইয়ুবীর নৌবহর বা কোন প্রতিরক্ষা বাহিনী পড়ল না। নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন সমুদ্রে মাছ ধরা একটি জেলে নৌকা দেখতে পেল। ক্যাপ্টেন জাহাজটি তার নিকটবর্তী করে উপর থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের যুদ্ধ জাহাজ কোথায়? যদি মিথ্যা বলো, তবে ডুবিয়ে মারবো।'

জেলে অবাক হয়ে বললো, 'মিশরের জাহাজ! নৌবাহিনীর কোন যুদ্ধ জাহাজ তো এদিকে রাখা হয় না! সে সব থাকে এখান থেকে অনেক দূরে, ডকে। তবে মাঝে মধ্যে নৌবাহিনীর টহল জাহাজ এদিকে টহল দিতে আসে।'

খৃস্টান নৌবাহিনী জাহাজ থামিয়ে সেখানেই নোঙর ফেললো। ক্যাপ্টেন তাদের ইশারা করলো জাহাজে উঠতে। দুই জেলে নোঙর করা রশি বেয়ে জাহাজে উঠে গেল।

ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের জবাবে তারা মিশরের যুদ্ধ জাহাজের যে বর্ণনা শোনালো তা হলো, 'কয়েকটি জাহাজ এখন মেরামত করা হচ্ছে। আর যেগুলো ভাল সেগুলো আলেকজান্দ্রিয়া থেকে অনেক দূরে নিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে জাহাজ

আলেকজান্দ্রিয়া আসতে কম করেও দুই দিন সময় লাগবে। কারণ সেগুলোর পাল ছেঁড়া। দাঁড় এবং বৈঠার অবস্থাও ভাল নয়। আর তাতে মাল্লা এত কম যে, এত কম মাল্লা নিয়ে তাদের পক্ষে দ্রুত এগিয়ে আসা সম্ভব নয়।'

জেলেরা যে রিপোর্ট দিলো, তাতে খুবই মূল্যবান তথ্য পেল খৃস্টান বাহিনী। জেলেরা আরো বললো, 'সমুদ্র পথে আক্রান্ত হওয়ার কোন ভয় নেই দেখে সুলতান আইয়ুবী এদিকে কোন নজরই দেন না। তিনি নিজে কায়রো থাকেন বলে আলেকজান্দ্রিয়ার নিরাপত্তার দিকেও তার খেয়াল কম। যে সামান্য ক'জন সৈন্যকে তিনি এখানে পাঠিয়েছেন বেশ আরাম আয়েশেই দিন কাটাচ্ছে তারা। তারা সাগর তীরের জেলেদের গ্রামগুলোতে চলে যায় এবং তাদের মাছ লুট করে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।'

এডমিরাল জেলেদের ডেকে নিয়ে প্রচুর বকশিশ দিয়ে বললেন, 'শহরে কি পরিমাণ সৈন্য আছে যদি তোমরা খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাতে পারো তবে আরো অঢেল বকশিশ ভাগ্যে জুটবে তোমাদের। আমি তোমাদের অপেক্ষা করবো।'

খৃস্টান নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেনের জন্য এ তথ্য সুসংবাদ ছাড়া আর কি হতে পারে? ক্যাপ্টেন জাহাজ থামিয়ে একটি নৌকা নিয়ে নৌবাহিনীর এডমিরালের কাছে গেলেন। তিনি যে তথ্য জেলেদের কাছ থেকে পেয়েছেন তা এডমিরালকে বললেন।

এডমিরাল বললো, 'ভালই হলো, ময়দান একেবারে পরিষ্কার। এমনটিই হওয়া স্বাভাবিক। অহেতুক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কেইবা জোরদার করে!’

এডমিরাল সকল যুদ্ধ জাহাজকে সেখানেই নোঙর করতে আদেশ দিয়ে বললেন, ‘সন্ধ্যার পর আমরা তীরে নামবো।’

সব জাহাজেই তিনি খবর পাঠালেন, ‘জাহাজ এমন জায়গায় নিয়ে তীরে ভিড়াবে, যেখানে পানি গভীর, জাহাজ বালিতে আটকাবে না। আর সেখানে সৈন্যরা খুব নিরাপদে অবতরণ করতে পারবে।’

আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয় থেকে একটি নৌকা মুক্ত সাগরের দিকে চলে গেল। এই নৌকাটি দেখতে জেলেদের নৌকার মতই।

তখনও সূর্য ডুবে যায়নি। নৌকাটি খৃস্টান নৌবহরের নিকটবর্তী হলো। কম-বেশি প্রায় আড়াইশ যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রের দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে নোঙর করা আছে। জেলে নৌকাটি জাহাজগুলোর মাঝখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে করে এডমিরালের জাহাজ পর্যন্ত পৌছলো।

জেলেরা এডমিরালকে বললো, ‘আলেকজান্দ্রিয়া শহরে কোন সৈন্য নেই, শুধু শহরবাসী নাগরিকরা আছে। মিশরের যুদ্ধ জাহাজ এখান থেকে বহু দূরে নিরাপদ স্থানে রয়েছে।’

আসলে এই জেলে দু’জন ছিল মুসলমানদের গোয়েন্দা বাহিনীর দুই সদস্য।

রাতের প্রথম প্রহর! খৃস্টান নৌবাহিনীর প্রথম জাহাজটি কূলের দিকে অগ্রসর হলো এবং কোন বাঁধা ছাড়াই

আলেকজান্দ্রিয়ার পোতাশ্রয়ে নোঙর করলো। প্রথম সারির পেছনে দ্বিতীয় সারির জাহাজগুলো নোঙর করলো। এরপর এগিয়ে এলো তৃতীয় সারির জাহাজগুলোও। সৈন্য অবতরণের জন্য প্রত্যেক জাহাজের কূলে ভেড়ার কোন প্রয়োজন পড়ল না, বরং পেছনের জাহাজের সৈন্যরা সামনের জাহাজ হয়ে তীরে নেমে এলো।

এভাবেই আলেকজান্দ্রিয়াতে অতি গোপনে ও নীরবে নেমে এলো একদল খৃস্টান সৈন্য। চুপিসারে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তাদের কাছে যে তথ্য ও সংবাদ আছে তাতে তারা জানে, এখানে কোন সৈন্য নেই। ফলে বন্দর নগরী অধিকার করা তাদের জন্য কোন ব্যাপারই না।

কমাণ্ডিং অফিসার সৈন্যদের সরাসরি আলেকজান্দ্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়ে বললো, 'এ শহর এখন আমাদের। এখানে প্রবেশ করতে এখন আর কোন বাঁধা নেই। অতএব যাও, যার যেভাবে খুশি প্রবেশ করো শহরে। ভোগ করো, লুট করো। শহরবাসীকে বুঝিয়ে দাও তারা এখন কাদের রাজত্বে বাস করছে।'

খৃস্টান সৈন্যরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে ছুটল শহরের দিকে। খুশি আর ধরে না তাদের। যার যে ঘরে খুশি ঢুকে লুট করবে, উপভোগ করবে নারীদের। লোভে চকচক করে উঠল ওদের চোখগুলো।

যখন খৃস্টান সৈন্যদের ভীড় শহরের নিকটবর্তী হলো, কেউ কেউ ঢুকে পড়ল শহরের গলিতে, তখন সহসা তাদের ডানে ও বামে আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো। শুকনো ঘাস ও খড়ের

স্তুপে, কাঠ-খড়ির গাদায় তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল কারা যেন। সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। এতে করে খৃস্টান সৈন্যদের লোভাতুর বিভৎস চেহারাগুলো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। দেখা গেল, পঙ্গপালের মত দল বেঁধে ওরা হুড়মুড় করে শহরে প্রবেশ করছে। এই সুযোগের জন্যই যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছিল মুসলিম ফৌজ।

শহরের অলিতে গলিতে মশালের আলো জ্বলে উঠলো। বাড়ীর ছাদ থেকে শুরু হলো বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ। হতচকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল খৃস্টানরা। রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়লো অতি উৎসাহী অগ্রগামী বাহিনী। তাদের দিশেহারা ভাব কাটতে যে সময়টুকু লাগলো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো তীরন্দাজরা।

খৃস্টানরা যখন বুঝতে পারলো তারা আক্রান্ত হয়েছে তখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাইল তারা। পিছন ফিরে ছুটলো সমুদ্রের দিকে। রাস্তার দু'পাশে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আলোতে রাস্তার ছুটন্ত অবয়বগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রাস্তা থেকে একটু দূরে গেলেই আবার সেই সীমাহীন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কারা কোথায় ওঁৎ পেতে বসে আছে কিছুই দেখার সুযোগ পেল না তারা।

সৈন্যরা পিছন ফিরে দৌড় শুরু করতেই রাস্তার ডান দিক থেকে তাদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু হলো। নিখুঁত নিশানা প্রতিটি তীরের। রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগল খৃস্টান সৈন্যরা। পেছনে সরে যাওয়ারও এখন আর কোন উপায় রইল না তাদের।

আহতদের চিৎকার ও আর্তনাদে রাতের বাতাস প্রকম্পিত

ও ভারী হয়ে উঠলো। নতুন করে যারা তীরবিদ্ধ হচ্ছিল তাদের গগনবিদারী চিৎকারে কেঁপে উঠছিল শহর।

এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল কম করেও দুই হাজার খৃস্টান সৈন্য। তাদের মধ্যে খুব কমই জীবিত ফিরে যেতে পারল। খৃস্টানদের যেসব সৈন্য জাহাজে ছিল তাদেরকে পাল্টা আক্রমণের হুকুম দিল উপস্থিত সেনাপতিগণ। একদলকে নেমে সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়া হলো। জাহাজের মধ্য থেকে খৃস্টানরা মেনজানিক দিয়ে অগ্নি গোলা ও দূরপাল্লার তীর বর্ষণ করতে লাগলো।

হঠাৎ খৃস্টানদের সবচে পিছন সারির দু-তিনটি জাহাজে দেখা গেল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। দেখতে দেখতে আরো দুতিনটি জাহাজে আগুন লেগে গেল। কিভাবে এ অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো কিছুই বুঝতে পারলো না খৃস্টানরা। তারা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সেই অগ্নিশিখার দিকে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, দেখা গেলো, সমস্ত সাগরে দৈত্যের মত আগুন জ্বলে উঠেছে আর সেই আগুন ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে।

খৃস্টানরা এমন অতর্কিত ও বেপরোয়া হামলার আশংকা করেনি। তারা তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছিল সৈনিকদের নামার সুবিধের জন্য। এই সুবিধা যে একটু পর তাদের জন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে তা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি।

এ ছিল রণনিপুন সুলতান আইয়ুবীর এক দৃষ্টান্তমূলক রণকৌশল। সহজেই খৃস্টানরা তাঁর পাতা ফাঁদে পা দিল।

দিনের বেলা যে জেলে খৃস্টানদের সংবাদ পৌছিয়ে দিয়েছিল সে জেলে ছিল আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের এক চৌকস গোয়েন্দা। জেলে মারফত খৃস্টান নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন যে তথ্য জেনেছিল, সে তথ্যগুলো ছিল সম্পুর্ণ ভুল ও বানোয়াট। তবে জেলে একটি তথ্য ঠিকই দিয়েছিল, মিশরের নৌবহর সেখান থেকে আসলেই অনেক দূরে ছিল। আশেপাশে নৌবাহিনীর অস্তিত্ব নেই দেখেই খৃস্টান কমাণ্ডার জেলের বক্তব্য বিশ্বাস করেছিল।

আইয়ুবী তাঁর এডমিরালকে বলে রেখেছিলো, 'সাগরের দিকে কড়া দৃষ্টি রেখো। যে কোন সময় খৃস্টান বাহিনী এসে পৌঁছতে পারে। বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের আমি আক্রমণ করতে চাই না। যত বড় বাহিনীই আসুক, তাদের মোকাবেলা করবে কমাণ্ডো বাহিনী দিয়ে।'

এডমিরাল সেই মতই সতর্ক দৃষ্টি রেখে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। যথাসময়েই তিনি খবর পেয়েছিলেন খৃস্টান নৌবাহিনীর আগমনের। তিনি তার মেনজানিক ও গোলা বারুদপূর্ণ জাহাজগুলো বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। জাহাজের পাল নামিয়ে ফেলেছিলেন দূর থেকে যেন জাহাজগুলো চোখে না পড়ে সে জন্য। জাহাজের প্রতি দাঁড়ে দু'জন করে মাল্লা নিযুক্ত করে রেখেছিলেন তিনি যাতে সময়মত জাহাজের গতি দ্রুত করা যায়।

সন্ধ্যার পরে যখন খৃস্টানদের যুদ্ধ জাহাজগুলো সাগরের কূলে ভিড়লো, তখন এডমিরাল তাঁর জাহাজগুলোতে মাস্তুল ও পাল তুলে দিলেন। মাল্লাদের বললেন, 'জাহাজ দ্রুত

আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে নিয়ে চলো।'

মাল্লারা দ্রুত পৌঁছার জন্য জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগলো এবং সময় মতই খৃস্টানদের জাহাজগুলোর পিছনে এসে পৌঁছল। যখন খৃস্টানরা জাহাজগুলো একসাথে বেঁধে রেখে শহরে চড়াও হলো তখন সন্তর্পনে আইয়ুবীর জাহাজ গিয়ে ভিড়ল সেই বেঁধে রাখা জাহাজের পাশে।

এরপর আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা খৃস্টানদের জন্য কেয়ামত ডেকে আনলো। যে খৃস্টানরা আইয়ুবীকে কৌশলে ধ্বংস করার মতলব এঁটেছিল, আইয়ুবীর কৌশলের কাছে মার খেয়ে তারাই এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল।

জেলেরা যখন খৃস্টান কমাণ্ডারকে রিপোর্ট করেছিল, আলেকজান্দ্রিয়া শহরে কোন সৈন্য মোতায়েন নেই, তখন শহরের সমুদ্র তীরবর্তী বাড়ীগুলো ছিল মুসলিম সৈন্যে ভর্তি। নগরবাসীদেরকে আইয়ুবী আগেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতান আইয়ুবীর এডমিরাল অল্প ক'টি জাহাজ নিয়ে তাদের মোকাবেলায় গিয়েছিলেন। তিনি তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করলেও শত্রুদের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। জাহাজে আগুন দেখেই ওরা বুঝে ফেলেছিল, ওরা আইয়ুবীর ফাঁদে পড়েছে। এর পরিণতি কি হতে পারে তা আন্দাজ করতে ওদের মোটেও বিলম্ব হয়নি। ওরা সংগী খৃস্টান সৈন্যদের রক্ষা করার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের জান নিয়ে তখনি সটকে পড়ে।

আগুন লাগা জাহাজগুলোর আলোতে সমুদ্রের বুক দিনের

মত ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। সেই আলোতে সুলতান আইয়ুবীর জাহাজগুলোও দেখতে পাচ্ছিল শত্রু বাহিনী। এক সাহসী ক্যাপ্টেন যখন বুঝলো, তারা চরমভাবে আক্রান্ত হয়েছে তখন সে তার জাহাজের মেনজানিকের নল ঘুরিয়ে দিল মুসলিম জাহাজগুলোর দিকে। তারপর জানের পরোয়া না করে অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ শুরু করলো।

তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি জাহাজের নল ঘুরে গেল মুসলিম রণতরীর দিকে। সেই বর্ষণের প্রচণ্ডতায় আইয়ুবীর বাহিনীর এডমিরাল তার জাহাজগুলোকে পিছনে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। কারণ শত্রু সেনাদের অক্ষত জাহাজের পরিমাণ তখনো কম নয়, তারা মুসলমানদের জাহাজগুলো ঘিরে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।

তিনি যখন পিছু হটছিলেন তখনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরে সুলতান আইয়ুবীর নিবেদিতপ্রাণ সৈন্যরা ভীষণ বেগে আক্রমণ চালালো সমুদ্র তীরে। তারা উপকুল থেকে জাহাজের ওপর তীর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। এই জানবাজ সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল মিশরীয়। সুলতান আইয়ুবী এদেরকে রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে প্রাথমিক যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এরা বেসামরিক পোষাকে সাধারণ নাগরিকের মত আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বিভিন্ন বাড়ীতে লুকিয়ে ছিল। অত্যন্ত গোপনে এদেরকে শহরের এসব বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ ছিল বুদ্ধি ও কৌশলের খেলা। তিনি যতটুকু সম্ভব কম সংখ্যক সৈন্য ক্ষয় করে যুদ্ধে জয় লাভ

করতে চাচ্ছিলেন। তাই যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য তিনি তাঁর নিজ কমাণ্ডে রেখে দিয়েছিলেন।

সারা রাত এ যুদ্ধ চললো। রাতভর সমুদ্রের মাঝে একের পর এক জাহাজ জ্বললো। জাহাজগুলোতে তখন কিয়ামতের বিভীষিকা। খৃস্টানদের জাহাজ ছিল অনেক বেশী। তারা একাধিকবার মুসলমানদের জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করলো। প্রতিবারই ব্যাপারটা প্রায় অবরোধের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার প্রাক্কালে কেমন করে যেন তা ভণ্ডুল হয়ে গেল। কোন না কোন ফাঁক-ফোকড় গলে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলো আইয়ুবীর রণতরী।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর নিয়োজিত সেনাপতিই তখনো পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। আইয়ুবী তাঁর বাহিনী নিয়ে দূর থেকে দেখছিলেন যুদ্ধের গতিবিধি।

মধ্যরাতের পর সুলতান তাঁর জিম্মায় রাখা জাহাজগুলোকে আদেশ দিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পুরো এলাকায় টহল দেয়া শুরু করো। নিজেদের নিরাপদ রেখে যতদূর সম্ভব শত্রুর জাহাজগুলোকে বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। কোথাও আমাদের কোন জাহাজ অবরোধের মধ্যে পড়ে গেলে তাকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব।'

রাতের শেষ প্রহর। খৃস্টান বাহিনী প্রাথমিক বিহবলতা কাটিয়ে উঠে নিজেদের বিশৃংখলা দূর করে অনেকটা সংহত অবস্থায় লড়াই করে যাচ্ছে। অনেক জাহাজ পুড়ে যাওয়া এবং কিছু জাহাজ পালিয়ে যাওয়ার পরও সংখ্যায় খৃস্টান বহরের

জাহাজ মুসলিম বহরের চাইতে অনেক বেশী। সুলতান তার সংরক্ষিত নৌবহরকে চূড়ান্ত হামলার আদেশ দিলেন। প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল নৌযোদ্ধারা। তারা জাহাজ থেকে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে অন্ধকারে চুপিসারে পৌঁছে যেতো শত্রু জাহাজের কাছে। তারপর তীর ধনুক ও গোলা বারুদ নিয়ে মেতে উঠতো শত্রু নিধনে।

এখন সকাল। টকটকে রক্তচক্ষু মেলে সূর্য উঠল পূর্ব দিগন্তে। তার আলোয় সমুদ্রের গভীর নীল জল এখন টকটকে লাল। মনে হয় ভোরের হাওয়ায় আদিগন্ত সমুদ্র জুড়ে বিশাল লাল সামিয়ানা দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে।

এডমিরাল নৌকা নিয়ে সাগরের পাড়ে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সাথে নৌবাহিনীর কয়েকজন সামরিক অফিসার। এডমিরালের গায়ের পোষাক রক্তে রঞ্জিত। তার একটি পা আগুনে ঝলসে গেছে। খৃস্টানদের মিনজানিকের গোলার আঘাতে তাঁর জাহাজে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। জাহাজটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি কয়েকজন অফিসারসহ নৌকা নিয়ে কোনরকমে কুলে এসে পৌঁছেছেন।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের জেটিতে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন যুদ্ধের অবস্থা। এডমিরাল তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌঁছলেন।

তিনি সংক্ষেপে দ্রুত সুলতান আইয়ুবীর কাছে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, 'আমাদের অর্ধেক জাহাজ এরই মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু খৃস্টানদেরও ক্ষতির পরিমাণ কম

নয়। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারবে না।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁকে বললেন, 'দুশ্চিন্তা করো না, অবশিষ্ট জাহাজগুলোও এখন যুদ্ধে নেমে পড়েছে।'

নৌবাহিনী প্রধান আইয়ুবীকে বললেন, 'খৃস্টান বাহিনীর সবচেয়ে বেশী ক্ষতিসাধন করা গেছে মাল বোঝাই জাহাজগুলোর। এ সব জাহাজে খাদ্যশস্য, ঘোড়া ও অস্ত্রপাতি বোঝাই ছিল। বোঝাইয়ের কারণে জাহাজের গতি ছিল মন্থর! ঘোরাতে ফিরাতেও অনেক সময়ের দরকার হতো। আমার জাহাজ ছিল যেমন হালকা তেমনি দ্রুতগতি সম্পন্ন।'

এডমিরাল বা আমীরুল বাহার এত বেশী আহত ছিলেন যে, তার শরীর ও মাথা ঘুরছিল। সুলতান আইয়ুবী তার চিকিৎসককে জলদি ডেকে পাঠালেন। কিন্তু এডমিরাল তার জখমকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না।

সুলতান আইয়ুবীর হেডকোয়ার্টার ছিল সাগর তীরের এক পাহাড়ী উপত্যকায়। তিনি আমীরুল বাহারকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে গেলেন। তাকে চিকিৎসকের হাতে তুলে দিয়ে এক উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে তাকালেন সমুদ্রের দিকে।

সূর্যের প্রথম কিরণে সাগর ও সাগর তীরে এক ভয়ংকর দৃশ্য ফুটে উঠলো। যতদূর দৃষ্টি যায় সমুদ্রের মাঝে জাহাজগুলো উন্মত্ত ষাঁড়ের মত ধাওয়া করে ফিরছে। অনেক জাহাজে তখনো আগুন জ্বলছিল। কিছু জাহাজের মাস্তুল ভেঙ্গে গিয়ে খান খান। কারো পাল অকেজো হয়ে যাওয়ায় জাহাজগুলো একই জায়গায় টালমাটাল অবস্থায় দুলছিল।

সাগরের মাঝে অসংখ্য লোককে সাঁতার কাটতে দেখা

গেল। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মৃতদের লাশগুলোকে সাগর তীরে এনে জড়ো করছে। চূড়ান্ত হামলার জন্য সুলতান যে জাহাজগুলো পাঠিয়েছিলেন সে জাহাজগুলোকে তিনি কোথাও দেখতে পেলেন না।

একটু পর। পশ্চিমে বহু দূরে সাগরের বুকে মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখা গেল, পরে পালও দৃষ্টিগোচর হলো। জাহাজগুলো সারিবদ্ধভাবে একে অন্যের সাথে একটা সমান্তরাল দূরত্ব বজায় রেখে যুদ্ধস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুলতান আইয়ুবী সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের জাহাজগুলো ছুটে আসছে!'

প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আমীরুল বাহার বাইরে এসে দেখেন সুলতান সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সুলতানের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন সাগরের দিকে। দেখলেন, মুসলিম নৌসেনারা জাহাজগুলো নিয়ে ছুটে আসছে যুদ্ধের মূল কেন্দ্রের দিকে। তিনি সুলতান আইয়ুবীকে কিছু না বলেই উপত্যকা থেকে নিচে নেমে এলেন।

তিনি একটি নৌকায় চড়ে বসলেন। নৌকাটি দশ দাঁড়ের এক দ্রুতগামী তরী। নৌকার পালে বাতাসের টান পড়লো। ছুটলো যুদ্ধস্থলের দিকে। সহসা সুলতান আইয়ুবীর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেই নৌকার ওপর। আহত আমীরুল বাহারকে আবার যুদ্ধের ময়দানে ছুটতে দেখে সুলতান আইয়ুবী চিৎকার করে উঠলেন, 'সাঈদী! তুমি ফিরে এসো। তোমার পরিবর্তে আমি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আবু ফরিদকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

আমীরুল বাহারের নৌকা ততোক্ষণে অনুকূল হাওয়ায় ছুটতে শুরু করেছে। তিনি উচ্চস্বরে হাত নেড়ে বললেন, 'সামান্য জখমের বাহানায় যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে থাকা ভীরু এবং কাপুরুষদের কাজ। আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান, যেখানে আমার সৈনিকরা অকাতরে শহীদ হচ্ছে আমাকে তাদের সাথে শামিল হতে দিন। আল্লাহ্ হাফেজ!'

আমীরুল বাহারের নৌকাটি দ্রুত সরে যেতে লাগলো উপকূল থেকে। এক সময় দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

এ সময় এক কাসেদ ছুটে এসে সুলতানকে সালাম দিল। আইয়ুবী তার দিকে তাকিয়ে সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, 'কি সংবাদ নিয়ে এলে তুমি?'

দূত বললো, 'আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে খৃস্টান সৈন্য অবতরণ করেছে। সেখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

সুলতান আইয়ুবী মনযোগ দিয়ে সংবাদ বাহকের কথা শোনলেন। তার কথা শেষ হলে বললেন, 'তুমি এখুনি আবার সেখানে ছুটে যাও। আমি যা যা বলছি, সেনাপতিকে গিয়ে সেই মত কাজ করতে বলবে। বলবে, এটা সুলতানের হুকুম।'

তিনি কিছু নির্দেশনা দিয়ে কাসেদকে পূনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

কাসেদ বিদায় হলে তিনি আবার সমুদ্রের দিকে তাকালেন। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলেন যুদ্ধের গতিবিধি। এক পর্যায়ে তিনি দেখতে পেলেন, খৃস্টানদের একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রায় সাগরের তীরে এসে গেছে। মুসলিম নৌবহরের একটি

জাহাজ তাকে ধাওয়া করে নিয়ে এসেছে এখানে। খৃস্টান জাহাজের দিশেহারা সৈন্যরা ক্রমাগত এলোপাথারি তীর বর্ষণ করে যাচ্ছে। মুসলিম জাহাজের সৈন্য ও মাল্লারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বেপরোয়াভাবে ছুটছে জাহাজটির দিকে। দেখতে দেখতে তারা খৃস্টান জাহাজটিকে ধরে ফেলল। একদল লাফিয়ে উঠে পড়ল খৃস্টানদের জাহাজে। শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ।

খৃস্টানরা মৃত্যুর পূর্বে শেষ মরণ কামড় বসালো মুসলিম সৈন্যদের ওপর। একসাথে কয়েকজন করে ছুটে এলো মুসলিম সৈন্যদের মোকাবেলা করার জন্য। প্রথম দিকে যারা জাহাজে চড়ল তাদের অনেকেই শহীদ হয়ে গেলো। তবে এ অবস্থা বেশীক্ষণ চললো না, আরো কিছু মুসলিম সৈন্য জাহাজে চড়তেই পাল্টে গেল দৃশ্যপট। একটু পরেই জাহাজ মুসলিম অধিকারে চলে এলো। কিন্তু এর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করলো মুসলিম জানবাজরা তার বর্ণনা দেয়া কোন কলমবাজের পক্ষে সম্ভব নয়।

নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম নৌসেনারা তাঁদের দেহের শেষ রক্তবিন্দু দ্বীনের জন্য নি:শেষে ঢেলে দেয়ার আকাঙ্খা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সীমাহীন সাহস, বীরত্ব, নৈপুণ্য ও কোরবানী দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল খৃস্টান সৈন্যরা। একসাথে একাধিক জাহাজের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, শত্রু জাহাজে অসংখ্য সৈন্য দেখার পরও তাতে লাফিয়ে চড়ার প্রতিযোগিতা, তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, এসব দেখে খৃস্টান সৈন্যদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেল।

উপায়ান্তর না দেখে খৃস্টানরা তাদের জাহাজ নিয়ে যুদ্ধের আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলো।

খৃস্টান বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল রাতের অতর্কিত আক্রমণেই। এতক্ষণ তারা যুদ্ধ করছিল অনেকটা নিরুপায় হয়ে, কিছুটা ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের শপথের কথা স্মরণ করে। তা ছাড়া সকাল পর্যন্ত তারা আশা করছিল, সুলতান আইয়ুবী যত বড় যুদ্ধবাজই হোক, সামান্য সংখ্যক নৌশক্তি নিয়ে সে কতটুকুই বা তাদের ক্ষতি করতে পারবে! সকাল হলে দিনের আলোয় আইয়ুবীর জাহাজ একটা একটা গিলে খাবে তারা। ধ্বংস করে দেবে আইয়ুবীর ক্ষুদ্র নৌবহর। চিরতরে মিটিয়ে দেবে যুদ্ধের সাধ।

কিন্তু সূর্যের তাপ যতই বাড়ল, ততই বাড়ল তাদের পালানোর আগ্রহ। দিনের শেষ প্রহরে তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে, তাদের পালানোর আগ্রহও নিঃশেষ হয়ে গেল। ভীতি আর হতাশা গ্রাস করলো তাদের। গুটিকয় মুসলমানের হাতে তাদের বিপুল বিশাল শক্তির শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংস দেখে তাদের হাত-পা যেন অসাড় হয়ে গেল। তাদের যে অল্প সংখ্যক সৈন্য সাগর তীরে অবতরণ করেছিল, তাদের অধিকাংশই আলেকজান্দ্রিয়ার রাতের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিন চার মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব দিকের যুদ্ধেও পরাজয় বরণ করেছিল তারা। যারা তখনো নিহত হয়নি তারা সকলেই অস্ত্র সমর্পণ করে বন্দীত্বকে কবুল করে নিল।

সুলতান আইয়ুবীর রিজার্ভ বাহিনীর দ্বিতীয় দলটি এখনও যুদ্ধে অংশই নেয়নি। সুলতান আইয়ুবীর নিয়োজিত সংবাদ

বাহকরা সামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতির খবর নিয়মিত এবং সারাক্ষণই সুলতানকে অবহিত করে যাচ্ছে। এ সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর যুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

যখন তিনি বুঝলেন, খৃস্টান বাহিনীর দম ফুরিয়ে এসেছে, এখন তারা যে যুদ্ধ চালাচ্ছে তা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তিনি দ্বিতীয় দলকে অনুমতি দিলেন যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার।

ইমরানের সংবাদ অনুসারে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকেও শত্রু সৈন্যের বহর আসার কথা। সে দিকে নূরুদ্দিন জঙ্গী ওঁৎ পেতে বসে আছেন। সুলতান আইয়ুবীও সে দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করলেন। যখন তিনি দেখলেন খৃস্টান নৌবাহিনী সমুদ্র পথে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি তৃতীয় যে দলটিকে নিজের কমাণ্ডে রিজার্ভ রেখেছিলেন, তাদেরকে বললেন, 'পলায়নপর খৃস্টান সৈন্যদের ধাওয়া করো এবং শত্রু সেনাদের ধরে আনো।'

সূর্য ডোবার শেষ কিরণ এসে পড়ল সাগর জলে। রক্তলাল পানিতে কচুরিপানার মত ভেসে বেড়াচ্ছে লাশ আর লাশ। সুলতান আইয়ুবী তাকিয়ে দেখলেন, সাগরের যুদ্ধভূমি এখন ফাঁকা। খৃস্টান নৌবাহিনীর প্রায় সমস্ত জাহাজই জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেছে। সে সব জাহাজের অধিকাংশই ডুবে গেছে সাগর জলে। এখনও যেগুলো ডুবেনি তাও ডুবোডুবো করছে। পলায়নরত যে সব জাহাজ ধরে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে একটু আগে, দূর থেকে সেগুলোর মাস্তুল ও বাদাম দেখা

যাচ্ছে। ক্রমশ সেগুলোও দূরে চলে যাচ্ছে।

যুদ্ধে লিপ্ত মুসলিম নৌবহরের যেগুলো ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে, সেগুলো ফিরে আসছে কূলে। সুলতান অনুমান করলেন, তাঁর অর্ধেক নৌবহর মিশরের জন্য কোরবান হয়ে গেছে। জাহাজের ডিঙি নৌকাগুলোও ফিরে আসছে সাগর তীরে। তাতে উপচে পড়া মুসলিম নৌবাহিনীর আহত ও ক্লান্ত সৈনিক।

সুলতান আইয়ুবী উপকুলে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলেন। একটি নৌকা সুলতান যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার কাছে এসে ভিড়লো। নৌকার ওপর একটি লাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা। সুলতান আইয়ুবী উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কার লাশ?'

'আমীরুল বাহার সা'দী বিন সাঈদীর!' এক মাল্লা বললো।

সুলতান আইয়ুবী দৌড়ে নৌকার কাছে ছুটে গেলেন। লাশের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখলেন, এডমিরালের লাশ রক্তে রঞ্জিত।

একজন নৌ অফিসার সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিষাদমাখা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'মাননীয় সুলতান, মুসলিম জাতির অভিভাবকদের জন্য আমীরুল বাহার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। সংকটময় মুহূর্তে যে জাতির কর্ণধারগণ সবার আগে এগিয়ে যায় জীবন বিলিয়ে দিতে, সে জাতির কোন সন্তান জাতির প্রয়োজনের চাইতে নিজের জীবনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে পারবে না কোনদিন। আমাদেরকে আমীরুল বাহার শিখিয়েছেন কিভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। শত্রুদের এক জাহাজের কাছে গিয়ে তিনি

নিজে সবার আগে শত্রু জাহাজে লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

তাঁকে জাহাজে লাফিয়ে পড়তে দেখে শত্রুদের প্রচণ্ড বাঁধা উপেক্ষা করে আমাদের বীর মুজাহিদগণ তাঁকে অনুসরণ করে। জাহাজে উঠেই তিনি অসীম বিক্রমে বেপরোয়া আক্রমণ চালান। খৃস্টানরা টিকতে না পেরে হাতিয়ার ফেলে সারেণ্ডার করলে তিনি জাহাজে মুসলিম পতাকা উড়িয়ে দেন। এ সময় খৃস্টানদের চারটি জাহাজ আমাদের ঘেরাও করে ফেলে। আমরা আমীরুল বাহারের নেতৃত্বে শত্রুদের দু'টি জাহাজ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই। কিন্তু অন্য দুটি জাহাজ আমাদের ওপর গজব ঢেলে দেয়। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে আমাদের জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। আমীরুল বাহারসহ আমাদের অধিকাংশ সাথী শহীদ হয়ে যান। আমরা কয়েকজন কোন রকমে তাঁর লাশ ডিঙি নায়ে তুলতে সমর্থ হই।'

সুলতান আইয়ুবী আমীরুল বাহারের লাশের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেই হাতে চুমু দিয়ে বললেন, 'বন্ধু আমার! ভাই আমার! তোমার জিম্মাদারী তুমি সর্বোচ্চ সাফল্যের সাথেই পালন করেছো। আমাদের এ বিজয়ের মহানায়ক তুমি, তুমিই সাগর বিজেতা আমীরুল বাহার। ইতিহাস বলবে, এ বিজয়ের কৃতিত্ব আমার। কিন্তু হে আল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ বিজয়ের সকল কৃতিত্ব এই সব শহীদ এবং শাহাদাতের জন্য পাগলপারা জিন্দাদীল মুজাহিদদের!'

তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, 'যত নৌকা আছে সমস্ত নৌকা নিয়ে সাগর চষে বেড়াও। যেখানে যত শহীদের লাশ আছে খুঁজে বের করো। আদবের সাথে সেই সব লাশ নিয়ে

এসো এই উপকূলে। কোন শহীদের লাশ যেন সমুদ্রে পড়ে না থাকে। সমস্ত শহীদদেরকে এই সমুদ্র তীরে দাফন করা হবে। সাগরের সুশীতল স্নিগ্ধ হাওয়া তাদের কবরগুলোকে চিরকাল যেন সুশীলত করে রাখে।'

উপস্থিত মুজাহিদরা সাথে সাথে নৌকা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সুবিশাল সমুদ্রবক্ষে। এ যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

০

বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে খৃস্টান বাহিনীর যে বিরাট সৈন্যদল স্থল পথে মিশরের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল, অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে এলো তারা। খৃস্টান নৌবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের কোন খবর তাদের কাছে পৌঁছেনি। ফলে অহংকার ও আনন্দের দ্যুতি খেলা করছিল তাদের চেহারায়। এই স্থল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন খৃস্টান জগতের মশহুর যোদ্ধা বীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট রিজনেল্ট।

তিনি তার বাহিনীকে তিনটি দলে বিভক্ত করলেন। অগ্রাভিযানে পাঠালেন প্রথম দলকে। দ্বিতীয় দলকে মধ্যবর্তী বাহিনী হিসাবে অগ্রগামী বাহিনী থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। তৃতীয় দলকে বললেন, 'অনেক দূর দিয়ে মূল বাহিনীর ডান দিক হয়ে অগ্রসর হবে।'

তিন বাহিনীর জন্য তিনজন সেনাপতি নিয়োগ করলেন তিনি। প্রধান সেনাপতি হিসাবে এই সম্মিলিত বাহিনীর মূল নেতৃত্ব ও কমাণ্ড ছিল রিজনেল্টের হাতেই। তাঁর মনে এ ধারনা বদ্ধমূল ছিল যে, তারা সুলতান আইয়ুবীকে সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারে এবং অতর্কিতে হামলা করে খুব সহজেই বিজয়

ছিনিয়ে নিতে পারবে। তার চোখের সামনে ভাসছিল তখন কায়রো শহরের ছবি। সঙ্গে ছিল অসংখ্য ঘোড়া গাড়ীতে পর্যাপ্ত খাঁদ্যশস্য।

আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে বেশ দূরে এক বিস্তীর্ণ বিরাণ এলাকা। এলাকাটিতে জনবসতি নেই বললেই চলে। অসংখ্য উঁচু নীচু টিলা, মাঠ ও কাঁটা ঝোপে পরিপূর্ণ এ প্রান্তরের আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ছিল মরুভূমি। সেই মরুভূমির মাঝে ছোট ছোট মরুদ্যান। এ সব মরুদ্যানে পানির কোন অভাব ছিল না। রিজনেল্ট এমনি একটি মরুদ্যানের পাশে ক্যাম্প করলেন। অগ্রগামী বাহিনীকে বললেন আরো এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্প করতে। তাঁর ডানের সৈন্য দলটি পরিকল্পনামাফিক বেশ পিছনে ও দূরে ছিল।

তখন রাত দ্বি-প্রহর। রিজনেল্টের ক্যাম্পের সৈনিকরা ঘুমে বিভোর। হঠাৎ সেখানে শুরু হয়ে গেল কিয়ামতের বিভীষিকা। রিজনেল্টের ঘুম ভেঙে গেল সৈনিকদের চিৎকার ও চেচাঁমেচিতে। ক্যাম্প জুড়ে কেন এত চিৎকার, চেঁচামেচি তিনি তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ এ কিয়ামত কোথেকে নাজিল হলো? আকাশ থেকে নামলো, নাকি তার সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে? এমনি অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন তিনি।

রিজনেল্ট কল্পনাও করতে পারেননি এত বড় বিশাল বাহিনী কারো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। মরুচারী বেদুঈনরা ছোটখাট কাফেলা আক্রমণ করে লুটপাট করে, তাদের পক্ষে

সেনাবাহিনীর ওপর চড়াও হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। সুলতান আইয়ুবীর এখন আলেকজান্দ্রিয়ায় খৃস্টান নৌসেনাদের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার কথা, নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাকে, তাহলে কে তাদের ওপর এমন ভয়ানক গজব নাজিল করলো?

কিন্তু তার জানা ছিল না, নূরুদ্দিন জঙ্গী কয়েক দিন আগে থেকেই তাঁর সৈন্যদল নিয়ে জনবসতিহীন টিলার পিছনে, উঁচু নিচু মাঠের গভীরে এবং কাঁটা ঝোপের আড়ালে গোপন আস্তানা গেড়ে ওঁৎ পেতে বসেছিলেন। তাদের দৃষ্টি ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আসা মরুভূমির পথের দিকে। নূরুদ্দিন জঙ্গী জানতেন, খৃস্টান বাহিনী পানির জন্য অবশ্যই কোন না কোন মরুদ্যানের পাশে ক্যাম্প করবে। সে জন্য তিনি মরুভূমিতে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিলেন। খৃস্টানদের অগ্রবর্তী সৈন্যদলটি দিনের বেলাতেই তাদের চোখের সামনে দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেল। জঙ্গী তাদের মোকাবেলায় না নামায় জঙ্গীর কমাণ্ডাররা বেশ নিরাশ এবং দুঃখ পেয়েছিল। তাদের বলা হলো, 'একটু অপেক্ষা করো। রাত নামুক, দেখবে এরচে বড় শিকার পাবে। রাতে আমরা তাদের ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ চালাবো।'

সেখানে কোন ক্যাম্প ছিল না। তাই কি করে জঙ্গী ক্যাম্পে আক্রমণ চালাবেন বুঝতে পারলো না অনেক সৈনিকই।

এক সময় তাদের চোখ অনেক দূরে ধূলিঝড় দেখতে পেল। তারা মনে করলো, মরুভূমিতে ঝড় শুরু হয়েছে। এ মরু ঝড় খুব মারাত্মক হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কোন মরু ঝড় ছিল না, এ ছিল খৃস্টান বাহিনীর মধ্যবর্তী মূল সেনাদলের অশ্বখুরের উড়ন্ত ধূলি। তারা মরুদ্যানের কাছে এসে রাত্রি

যাপনের জন্য থামলো। নূরুদ্দিন জঙ্গী গোপন অবস্থান থেকে সবই দেখলেন। খৃস্টান বাহিনী মামুলি ভঙ্গিতে তাবু টানালো, কারণ ভোরেই তাদের যাত্রা করতে হবে। পশুগুলোকে পৃথক স্থানে বেঁধে রাখলো। ধীরে ধীরে অস্তাচলে ডুবে গেল সূর্য।

মধ্য রাতে জঙ্গীর সৈন্যরা সালারের নির্দেশে গোপন আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। এদের সবাই ছিল অশ্বারোহী। ঘুমন্ত খৃস্টান সৈন্যদের ওখানে গিয়ে প্রথমে তারা অন্ধকারে এলোপাথাড়ী তীর বর্ষণ করলো। যখন পাহারারত সৈনিকরা আহত হয়ে ডাক-চিৎকার শুরু করলো, তখন ঘুমন্ত সৈন্যদের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং তারা বাইরে এসেই তীরের আওতায় পড়ে গেল। তাঁরা যখন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল তখন অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ঘোড়া তীরবেগে ছুটিয়ে দিল সেই সৈনিকদের ওপর দিয়ে।

তারা অন্ধকারে এলোপাথাড়ি বর্শা ও তলোয়ার চালাতে লাগল। খৃস্টান সৈন্যরা সতর্ক হওয়ার আগেই অশ্বারোহীরা আর এক দফা আক্রমণ চালিয়ে খৃস্টান বাহিনীর বাঁধা ঘোড়াগুলোর রশি কেটে দিলো। ঘোড়াগুলো ছাড়া পেয়েই ছুটে পালালো মরুভূমির বিপুল বিস্তারে।

রিজনেন্ট নিরূপায় হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন এবং ডানের সেনাদলে গিয়ে পৌঁছলেন। এ দলটি বহু দূরে একস্থানে ক্যাম্প করে বিশ্রামে নিচ্ছিল। নূরুদ্দিন জঙ্গীও রিজনেন্টকে অনুসরণ করে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। এই বাহিনীর পিছনেই ছিল সমস্ত রসদপত্র বোঝাই ঘোড়া ও খচ্চরের কাফেলা। এই কাফেলার বন্দোবস্ত করার জন্য

নূরুদ্দিন জঙ্গী আলাদা বাহিনী নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তারা এখানে না থেমে এগিয়ে গেল সেদিকে। ভোরের আলো ফুটতেই রসদপত্রের কাফেলা নজরে পড়লো তাদের। বিলম্ব না করে তারা ঝাপিয়ে পড়লো কাফেলার ওপর এবং সহজেই কজা করে নিলো সব রসদপত্র।

রিজনেল্ট পৌঁছতেই ডান দিকের বাহিনী সতর্ক হয়ে গেল। সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হলো তারা। রিজনেল্ট তাঁদেরকে নিয়ে ছুটলেন নিজের দলের দিকে। কারণ তিনি সেটাকেই যুদ্ধের ময়দান হিসেবে গণ্য করলেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই সেনাদল নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন যেখানে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেদিকে। নূরুদ্দিন জঙ্গী সৈন্য গুছিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করতেই দেখলেন খৃস্টান সেনাদল যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। তিনি তাদের ওপর পিছন ও পাশ থেকে তীব্র আক্রমণ চালালেন। তারা বুঝতেই পারলো না, কোত্থেকে এবং কেমন করে তাদের ওপর এমন কঠিন মুসিবত নেমে এলো। সুলতান আইয়ুবীর মত সুলতান জঙ্গীও সামনাসামনি লড়াইয়ের ঝুঁকি না নিয়ে তাদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালালেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল তুফানের মত তাদের একদিক দিয়ে আক্রমণ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতো। ফলে খৃস্টান বাহিনীর অটুট শৃংখলা তছনছ হয়ে ভেঙ্গে পড়তো, ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতো খৃস্টানদের সাজানো সারি।

সেই রাতেই তিনি সুলতান আইয়ুবীর কাছে খবর পাঠালেন। কারণ এঁরা দুই সেনাপতি আগে থেকেই যুদ্ধের নীল-নকশা এঁকে রেখেছিলেন। জঙ্গীর প্রতিটি এ্যাকশন

পরিকল্পনা ছিল শত্রুর পরিকল্পনা ও চিন্তার বাইরে। তিনি তাঁর প্ল্যান অনুসারেই যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। রিজনেল্ট তার নিজ বাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে পিছনে সরে আসার সংবাদ পাঠালেন।

চারদিন ধরে রিজনেল্ট ও জঙ্গীর বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ চলতে থাকলো। সুলতান জঙ্গী খৃস্টান বাহিনীকে আক্রমণ করে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তাঁর পলিসিই ছিল 'আক্রমণ কর! আর পালাও।'

খৃস্টানদের অগ্রবর্তী দল যখন ফিরে এলো, তখন তাদের উপরও পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ হলো। এই আক্রমণ চালালো সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী।

এই গেরিলা বাহিনী একই রাতে তাদের ওপর দু'তিনবার ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ঝড়ের বেগে এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার আগে তছনছ করে দিয়ে গেল তাদের সাজানো দৃশ্যপট। এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকলো।

খৃস্টান বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে পারদর্শী হলেও কমাণ্ডো হামলা প্রতিরোধে ছিল দুর্বল। তারা সামনাসামনি যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী ও জঙ্গী তাদের এ আশা পূরণ করেননি।

গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি মোটেই সহজ ছিল না। একশ জনের একটি দল আক্রমণে গেলে দেখা যেতো বিশ-ত্রিশ জনই শহীদ হয়ে গেছে। প্রতিটি আক্রমণেই শহীদের সংখ্যা অল্প-বিস্তর বাড়তো। এই গেরিলা যুদ্ধের জন্য বিশেষ দক্ষতা, সাহসিকতা, বীরত্ব ও ক্ষীপ্রতার প্রয়োজন হতো। যে গুণগুলোর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সুলতান আইয়ুবী ও জঙ্গী তাঁদের

কমাণ্ডো বাহিনীকে।

যুদ্ধ অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। খৃস্টান সৈন্যদের মাঝে শুরুতেই জঙ্গী যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল তা কাটিয়ে উঠে তারা আর পূনরায় একতাবদ্ধ হতে পারেনি। তাদের সংখ্যা শক্তির আধিক্য না থাকলে অনেক আগেই তাদের পরাজয় বরণ করতে হতো। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা লড়াই অব্যাহত রাখতে সমর্থ হলো।

খৃস্টানদের রসদপত্র নূরুদ্দিন জঙ্গীর কব্জায় এসে গিয়েছিল। ফলে রসদের সরবরাহ না পাওয়ায় খৃস্টানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করলো। মুসলমানরা গেরিলা পদ্ধতিতে যে যুদ্ধ চালাচ্ছিল সে যুদ্ধের মোকাবেলা করার মত অবস্থাও তাদের ছিল না। ফলে যুদ্ধের গতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো, খৃস্টান সৈন্যরা ময়দান থেকে সটকে পড়ার চিন্তা করতে বাধ্য হলো।

চতুর্থ দিন থেকেই শুরু হলো এ পলায়নের পালা। যে-ই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলো সে-ই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল নিজের। আর যে পালাবার সুযোগ পেল না, সে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করলো প্রাণের মায়ায়। কিন্তু রিজনেল্ট সহজে পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ। তিনি আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে সৈন্যদের একত্রিত করার উদ্যোগ নিলেন। নিজের গোয়েন্দা বাহিনীকে লাগালেন ময়দানের অবস্থা জানার কাজে। গোয়েন্দা মারফতই খবর নিলেন নূরুদ্দিন জঙ্গী এখন কোথায় আছেন। এভাবে আটঘাট বেঁধে তিনি জঙ্গীর ওপর এক সাড়াশি আক্রমণ চালালেন।

এ আক্রমণ ছিল যেমন মারাত্মক তেমনি অতর্কিত ও বেপরোয়া। খৃস্টানরা জীবন বাজি রেখে লড়াই শুরু করলো। রিজনেল্টের কৌশল এবং সৈন্যদের উপর তার দক্ষ নিয়ন্ত্রণ আশাতীত ফল দিল তাদের। কিন্তু পঞ্চম রাতে জঙ্গী কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদকে নিয়ে জীবনকে, বাজী রেখে স্বয়ং রিজনেল্টের তাঁবুতে অতর্কিত আক্রমণ চালালেন। এ আক্রমণ প্রতিরোধ করার সাধ্য ছিল না রিজনেল্টের। রিজনেল্ট বন্দী হলেন।

পরদিন ভোর। খৃস্টানদের দুঃসাহসী সেনাপ্রধান রিজনেল্ট বন্দী অবস্থায় নূরুদ্দিন জঙ্গীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতান জঙ্গী তাঁকে শোনাচ্ছেন সন্ধির শর্তগুলো। খৃস্টান সেনাপতি চুপচাপ শুনে গেলেন জঙ্গীর সব শর্ত।

সুলতান জঙ্গীর বলা শেষ হলে রিজনেল্ট বললেন, 'আপনার সব শর্তই আমি মেনে নিতে রাজী। শুধু একটি শর্তের ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করবেন। বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে কোন শর্ত মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

জঙ্গী বললেন, 'বায়তুল মোকাদ্দাস আমাদের দিয়ে দাও, বিনিময়ে তোমরা সকলেই মুক্তি পাবে।'

সন্ধ্যা নাগাদ সুলতান আইয়ুবীও এসে গেলেন। রিজনেল্টকে সসম্মানে রাখা হয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী তার সঙ্গে করমর্দন ও আলিঙ্গন করলেন।

'আপনি তো এক মহান সৈনিক?' রিজনেল্ট সুলতান আইয়ুবীকে বললেন।

'না। একথা বলুন, ইসলাম এক মহান ধর্ম। সৈনিক সেই

মহান, যার ধর্ম মহান!'

'মুহতারাম রিজনেল্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তাঁর সামুদ্রিক নৌবহর কোথায়? তারা কি এখনো আসেনি? এ ব্যাপারে সঠিক উত্তর তুমিই দিতে পার। আমি তো সেখানে ছিলাম না।' নূরুদ্দিন জঙ্গী সুলতান আইয়ুবীকে বললেন।

'আপনার বিশাল নৌবহর খুব জাকজমকের সাথেই এসেছিল।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আপনার অনেক জাহাজ সাগরের অতল তলে আছে। আর যেগুলো ডুবে যায়নি, সেগুলোর পুড়ে যাওয়া কাঠামো সাগর জলে ভাসছে। দু'একটি হয়তো ফিরেও গেছে। যে সব সৈনিকরা জাহাজ থেকে নেমে এসেছিল, তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। আমি আপনার সৈন্যদের সমস্ত লাশ সসম্মানে দাফনের ব্যবস্থা করেছি। আর যারা বেঁচে আছে তারা এখনো আমার হেফাজতেই আছে।'

সুলতান আইয়ুবীর বর্ণনা শুনে রিজনেল্টের চোখে মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠলো। কারণ এসব কথা কিছুতেই তার সঠিক মনে হচ্ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যদি এসব সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, কেমন করে এমন অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হলো?'

'এই গোপন তথ্য সেদিন বলবো, যেদিন ফিলিস্তিন থেকে খৃস্টানদের শেষ সৈন্যটিও বিদায় নেবে।' নূরুদ্দিন জঙ্গী বললেন, 'আপনার এই পরাজয় আপনাদের শেষ পরাজয় নয়। কারণ আপনারা এখনো এ মাটি থেকে বিদায় নিতে রাজী নন।'

'আমি আপনাকে আমাদের বিশাল এলাকা দান করবো।' রিজনেল্ট বললেন, 'আমাকে মুক্ত করে দিন। আমি যুদ্ধ নয়,

চুক্তি করব আপনার সাথে। এতে আপনার রাজ্য আরো প্রশস্ত হবে।'

'আমাদের কোন রাজ্যের প্রয়োজন নেই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমরা শুধু আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেখানে মানুষের মৌলিক মানবীয় অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। যেখানে নিরীহ, নিরন্ন, দুঃখী মানুষও পাবে সুন্দরভাবে বাঁচার গ্যারান্টি। সভ্যতা পাবে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার নিশ্চয়তা। লাঞ্ছিত মানবতা ও বঞ্চিত পৃথিবী কল্যাণের স্পর্শে সজীব ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনাদের উদ্দেশ্য ইসলামকে নি:শ্চিহ্ন করা, কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়। এ কাজে আপনারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখেছেন, নৌশক্তি পরীক্ষা করে দেখেছেন। যুবতী কন্যাদের আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে দেখেছেন, আমাদের জাতিকে বিশ্বাসঘাতক গাদ্দার বানিয়ে দেখেছেন। শত শত বছর ধরে আপনাদের এই যে সাধনা, এর মধ্য দিয়ে আপনারা কতটুকু সফলতা লাভ করেছেন?'

'সুলতান, আমরা একেবারে বিফল হয়েছি এ কথা আপনি বলতে পারেন না। স্মরণ করুন, ইসলাম তো রোম সাগর পার হয়ে ইউরোপেও পৌছে ছিল! কিন্তু স্পেন থেকে ইসলাম কি পিছু সরেনি? রোম আপনাদের অধিকার থেকে কেন মুক্ত হলো? আর সুদান আপনাদের কেনইবা শত্রু হয়ে গেল? শুধু এই কারণে যে, আমরা ইসলামের রক্ষকদেরকে কিনে নিতে পেরেছি। আজও বহু মুসলিম এবং মুসলিম শাসক আমাদের অর্থ সম্পদের কেনা গোলাম। এসব রাজ্যে এখন শুধু মুসলমান

পাবেন, কিন্তু তাদের কাছে ইসলাম পাবেন না। এটা কি আমাদের বিজয় নয়?'

'আমরা সে সব জায়গায় আবার ইসলামকে জীবিত করব বন্ধু!' সুলতান আইয়ুবী বললেন।

'আপনি অলীক স্বপ্ন দেখছেন সালাহউদ্দিন!' রিজনেল্ট বললেন, 'আপনারা দু'জন আর কতকাল বেঁচে থাকবেন? আর কতকাল যুদ্ধ চালানোর যোগ্য থাকবেন? ইসলামের দেখাশোনা ও খেদমতই বা আর কতদিন করবেন? আমি আপনাদের দু'জনকে কুর্নিশ করি এ জন্য যে, আপনারা দু'জনই ধর্মের নি:স্বার্থ এবং যোগ্য খাদেম। আপনাদের মত নি:স্বার্থ খাদেম হয়তো খুঁজলে আরো পাবেন আপনার জাতির মধ্যে কিন্তু যোগ্য খাদেম তেমন পাবেন না। বরং আপনাদের জাতির মধ্যে ধর্মকে নিলামে তোলার লোকের সংখ্যাই এখন বেশী। আর আমরা সেই নিলামের এক নম্বর খরিদদার।

যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আপনার জাতিকে বিলাসিতা, লোভ ও আনন্দ-স্ফূর্তির স্বপ্নিল নেশা থেকে রক্ষা করতে পারতেন, তবে আমাদের সাথে আপনার যুদ্ধ করার প্রয়োজনই পড়তো না। আমরা আপনাদের মোকাবেলায় একটি দিনও টিকতে পারতাম না। কিন্তু বন্ধু! আপনি তা কখনও পারবেন না। কারণ এ বিলাসিতা ও আনন্দ-স্ফূর্তির নেশায় কেবল সাধারণ মানুষই পড়েনি, সামর্থবান ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীই পড়েনি, আলেম ওলামা এবং জাতির নেতা ও শাসক শ্রেণীও এই বিলাসিতায় ডুবে আছে।

এই বাস্তবতা থেকে আপনি দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে পারেন না।

দুর্নীতিপরায়ন শাসক ও নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যে পাপের সৃষ্টি হয়, সে পাপ জাতীয় প্রথা হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। সমাজের মাথায় পচন ধরলে সে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে পাপ। আমরা আপনার শাসন বিভাগে এই পাপের জাল বিস্তার করে চলেছি। আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি আমাকে হত্যা করুন বা আমার মত আরও কিছু খৃস্টান শাসককে হত্যা করুন, তারপরও ইসলাম শেষ হবেই। আমরা যে রোগের বিষ আপনার জাতির দেহে ঢুকিয়ে দিয়েছি, সে বিষের ক্রিয়া ক্রমশ বাড়তেই থাকবে, কমবে না।'

তিনি এমন বাস্তবতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন যার সত্যতা নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং সুলতান আইয়ুবী অস্বীকার করতে পারছিলেন না। এ পর্যন্ত তাঁরা খৃস্টানদের ওপর যে বিরাট বিজয় লাভ করেছেন, যার ফলে এখন খৃস্টান বাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ড এবং বহু খৃস্টান সৈন্য তাদের যুদ্ধবন্দী, এর সবই সম্ভব হয়েছে মাত্র একজন গোয়েন্দার সঠিক তথ্যের কারণে, যিনি আক্রা থেকে এই আক্রমণের সংবাদ যথাসময়ে নিয়ে এসেছিলেন। সুলতান ভাবছিলেন, একজন গাদ্দারও তো মুসলমানদের জন্য এমনি বিপদ ও দুর্দশার কারণ হতে পারে!

o

রিজনেল্ট ও অন্যান্য বন্দীদের সবাইকে নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাকে নিয়ে গেলেন। সুলতান আইয়ুবী তাঁদের বিদায় দিয়ে চলে এলেন কায়রো। তিনি চিন্তাও করতে পারেননি, এরপর আর কখনও নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে তাঁর দেখা হবে না। তিনি এ আনন্দেই বিভোর ছিলেন, নূরুদ্দিন জঙ্গী রিজনেল্টের মত

মূল্যবান কয়েদীর বিনিময় মূল্যবান এবং উপযুক্ত শর্ত দিয়েই করবেন।

নূরুদ্দিন জঙ্গীও তাঁর চিন্তায় কিছু পরিকল্পনা তৈরী করে রেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। ১১৭৪ খৃস্টাব্দের মার্চের প্রথম দিকে সিরিয়ায় কঠিন ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পে সাতটি গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রাজধানী দামেস্কেরও অনেক ক্ষতি হয়। ঐতিহাসিকরা এই ভূমিকম্পকে ইতিহাসের সবচে বড় ভূমিকম্প বলে উল্লেখ করেছেন। এতে মুসলিম সালতানাতের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর অন্তরে ছিল নিজের দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ভালবাসা ও দরদ। ভূমিকম্পের খবর পেয়েই তিনি তাদের সাহায্যের জন্য ক্রাক থেকে দূর্গত এলাকায় চলে এলেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্দীদেরকে ক্রাকে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। ফলে তিনি রিজনেল্ট ও অন্যান্য খৃস্টান বন্দীদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন।

তিনি বন্দীদেরকে দামেস্কে রেখে দুর্গত এলাকার দিকে নজর দিলেন। দামেস্ক ও তার আশপাশের অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না। দামেস্ক পৌছেই তিনি দূর্গত এলাকার জনগণকে দেখতে যান। তাদের দেখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের দু:খে পীড়িত জঙ্গী রাজধানী থেকে দূরে সে সব গ্রামে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। মন-প্রাণ দিয়ে লোকদের সাহায্য ও সেবা করতে লাগলেন তিনি। যেখানে রাত হতো সেখানেই তিনি রাত কাটাতেন। খাবারের দিকেও কোন খেয়াল ছিল না তাঁর। নিজের খাবার কে দিল আর কোথেকে

এলো তা নিয়েও তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না।

এপ্রিলের শেষের দিকে তিনি দূর্গত এলাকার পুনর্বাসনে হাত দিলেন। এই ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ একদিন তিনি গলার ভেতর ব্যথা অনুভব করলেন। ব্যথা বাড়লে তিনি ডাক্তারকে দেখালেন। বললেন, 'আমার গলার ভেতর কেন যেন ব্যথা করছে।'

ডাক্তার নানা রকম ঔষধপত্র দিল, কিন্তু গলার ব্যথা বেড়েই চললো তাঁর। হাকীম চিকিৎসায় কোন ত্রুটি করলেন না। কিন্তু রুগীর অবস্থা তবু দিন দিন খারাপের দিকেই এগিয়ে চললো। এক সময় কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। ১১৭৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গলা ব্যথায় ভুগতে ভুগতে তিনি চির নিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নূরুদ্দিন জঙ্গী কঠিন গলার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন, জঙ্গীকে হাসান বিন সাবার ফেদাইন গ্রুপের লোক বিষ প্রয়োগ করেছিল। বিষ প্রয়োগ ঠিক তখন করেছিল, যখন জঙ্গী দূর্গত মানুষের পাশে গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। তখন তার খাবার পরিবেশন ও রান্নায় যে অব্যবস্থা হয়েছিল তারই সুযোগ নিয়েছিল ফেদাইন দলের গুপ্তচরেরা। তারা এমন বিষ খাওয়াতে থাকে, যে বিষের ক্রিয়া শুরু হয় আস্তে আস্তে ও অনেক পরে। ডাক্তার এ বিষের ক্রিয়া বুঝতেই পারেননি। জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খান তাঁর ইংরেজী বই 'গেরিলা ওয়ার'-এ নামকরা বড় বড় ঐতিহাসিকের দলিল পেশ করে এ সত্যতা যাচাই করেছেন

যে, নূরুদ্দিন জঙ্গী ফেদাইনদের বিষের শিকার হয়েছিলেন।

সামান্য গলা ব্যথা তার মৃত্যুর কারণ হবে, জঙ্গী হয়তো এমনটি ভাবেননি। এজন্যই তিনি কোন অসিয়ত করে যাননি। সুলতান আইয়ুবীকেও তার অসুস্থতার খবর পাঠাননি। সুলতান আইয়ুবীর কাছে তখন এ সংবাদ পৌঁছে, যখন জঙ্গীর দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

এ খবর পাওয়ার কয়েকদিন পর।

দামেস্ক থেকে আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা এসে কায়রো পৌঁছলো। আইয়ুবীর সঙ্গে দেখা করে জানালো, 'মুসাল ও হলবের গভর্নররা নিজেদেরকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। দামেস্কের আমীর ওমরাহ, উজির নাজিররা নূরুদ্দিন জঙ্গীর পুত্র আলমালেকুছ ছালেহ, যার বয়স সবেমাত্র এগারো, তাকেই ইসলামী সাম্রাজ্যের খলিফা নিযুক্ত করেছে।'

সুলতান আইয়ুবী বুঝতে পারলেন, উজির ও উমরারা এই নাবালেগ কিশোর খলিফাকে কোন পর্যায়ে নামিয়ে দেবে, আর তারা কি খেলাই না শুরু করবে।

সুলতান আইয়ুবী আলী বিন সুফিয়ানকে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, 'তুমি পাঁচ মাস আগে যখন জানালে যে আক্রাতে আপনার এক গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, আর অপরজন গ্রেফতার হয়েছে, কেবল তাদের দলনেতা ফিরে আসতে পেরেছে, তখনই আমার মনে হয়েছিল, এই বছরটা ইসলামী জগতের জন্য অমঙ্গল ও কঠিন পরীক্ষার বছর। এই পরীক্ষা দিতে হবে বিভিন্ন সেক্টরে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে। এখন আমার কথা

মনোযোগ দিয়ে শোনো! সেই পরীক্ষার এক ভয়ংকর লগ্ন আমার সামনে উপস্থিত। আমাকে এখন আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নামতে হবে।'

০

সুলতান আইয়ুবী তাঁর সভাসদদের বৈঠক ডাকলেন। নূরুদ্দিন জঙ্গীর অনুপস্থিতিতে ইসলামী সাম্রাজ্যে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে তার মোকাবেলা করা যায় তাই এ বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়। এ সময় এক খাদেম এসে সুলতানকে জানাল, 'দামেস্ক থেকে নূরুদ্দিন জঙ্গীর বেগম এক কাসেদ পাঠিয়েছেন। কাসেদ আপনার জন্য বেগম জঙ্গীর চিঠি নিয়ে এসেছে। সে বলছে, 'এ চিঠি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনি তা সুলতানের কাছে পেশ করা জরুরী।'

আইয়ুবী বললেন, 'এখুনি আমি এ সভা মুলতবী করে দিচ্ছি। দরবারীরা বের হলেই ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দিও।'

এর কিছুক্ষণ পর। কাসেদ ভেতরে ঢুকে আদবের সাথে সালাম করে সুলতানের কাছে বেগম জঙ্গীর চিঠি পেশ করলো। চিঠিতে তিনি সুলতান আইয়ুবীকে বলে পাঠিয়েছেন, 'সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর প্রিয়তম দোস্ত ও সাথী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী! এখন ইসলামের সম্মান, ইজ্জত ও আবরু আপনার হাতে নির্ভর করছে। আপনি হয়তো জানেন, আমার শিশু সন্তানকে ইসলামী খেলাফতের খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে। সকলেই আমাকে সম্মান ও আনুগত্য দেখাতে শুরু করেছে। কারণ এখন আমি শিশু খলিফার মা। তারা মনে করছে, আমি ভাগ্যবতী মা কিন্তু আমার হৃদয়ে রক্ত অশ্রু

ঝরছে। তারা আমার সন্তানকে খলিফা নিয়োগ করেনি বরং আমার বুক থেকে আমার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে।

মুসালের আমীর সায়ফুদ্দিন ও অন্যান্য আমীররা আমার শিশু সন্তানকে ঘিরে রেখেছে। আমার স্বামীর ভাতিজারাও স্বাধীন শাসক হিসাবে নিজেদের ঘোষণা দিয়েছে। যদি আমার সন্তানকে ঘিরে রাখা আমীরদের মাঝে ইসলামের প্রতি মহব্বত, একতা ও সহনশীলতা থাকতো তবে আমি এতটা পেরেশান হতাম না। এরা একে অপরের দুশমন হয়ে গেছে। এসব আমীরদের কারো কাছ থেকেই আমি কোন মঙ্গলের আশা করতে পারি না।

যদি আপনি মনে করেন আমার সন্তানকে খুন করলে মিল্লাতের উপকার হবে, দ্বীনের তরক্কী হবে, তবে আমি নিজ হাতে আমার সন্তানকে খুন করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমীররা তাকে বলীর পাঠা বানিয়ে নিজেদের আখের গুছাতে চাচ্ছে। তার এ কোরবানী ইসলামী সালতানাত বা মিল্লাতের কোনই কাজে আসবে না। কিন্তু আমার শিশুপুত্র অসহায় ও দুর্বল। ধুরন্ধর আমীরদের কুটিল জাল ভেদ করে বেরিয়ে আসার সাধ্য তার নেই। তাই আমি এক কঠিন পরিণামের ভয় করছি। আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মেহেরবানী করে যত দ্রুত সম্ভব আপনি দামেস্ক চলে আসুন!

সুলতান আইয়ুবী, আপনিই ভাল বুঝবেন, আপনি কিভাবে আসবেন এবং এখানে আসার পর আপনার ভূমিকা কি হবে। আমি শুধু আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, যদি আপনি এ ব্যাপারে গুরুত্ব না দেন অথবা সময় নষ্ট করেন তবে খৃস্টানরা

বায়তুল মোকাদ্দাসের ওপর তো তাদের আধিপত্য বিস্তার করেই আছে, পবিত্র কাবা শরীফেও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

আমি আপনার কাছে জানতে চাই, তবে কি লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে? যারা নূরুদ্দিন জঙ্গী ও আপনার নেতৃত্বে জীবন কোরবানী দিয়েছেন তাদের সে কোরবানী কি বিফলে যাবে? আপনি হয়ত আমাকে প্রশ্ন করবেন, আমি কেন আমার সন্তানকে আমার প্রভাবে রাখতে পারছি না? আমি সে উত্তর প্রথমেই দিয়েছি। আমার সন্তানকে ওমরারা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। তার পিতার মৃত্যুর পর সে মাত্র একবার আমার কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিল। এখন তাকে আমার সন্তান বলে মনেই হয় না। আমার ধারণা, তাকে হাশিশ সেবন করিয়ে রাখা হচ্ছে, অথবা সে ওমরাদের কাছে নজরবন্দী আছে। সে হয়তো ভুলেই গেছে, আমি তার মা!

ভাই সালাহউদ্দিন, তুমি জলদি চলে এসো। ইসলামের প্রতি মহব্বত রাখে এমন হাজারো লোক এখনো দামেস্কে আছে। দামেস্কের এই লোকেরা তোমাকে স্বাগতম জানাবে। ভাই আমার! সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করো না। তুমি আমার কাসেদের কাছেই বলে দিও, তুমি কি করবে অথবা কিছুই করতে পারবে না।'

ইতি– তোমার এক হতভাগী বোন।

চিঠি পড়া শেষ করে মাথা তুললেন আইয়ুবী। কাসেদকে বললেন, 'তুমি এখুনি ফিরে যাও। জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীকে আমার সালাম দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে বলবে, আইয়ুবী আপনার চিঠির

মর্মার্থ ও গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। মুসলিম মিল্লাতের জন্য এ বড় নাজুক সময়। এ সংকটময় মুহূর্তে ধৈর্যহারা হলে সংকট বাড়বে বৈ কমবে না। এ সংকট নিরসনে আমি আমার সাধ্যমত পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবো না। কিন্তু এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হলে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। তাঁর চিঠির প্রতিটি শব্দ আমি আমার বুকে খোদাই করে নিয়েছি। তাঁকে শুধু বলবে, তিনি যেন আমার জন্য এবং এ জাতির হেফাজতের জন্য দোয়া করতে থাকেন।'

কাসেদকে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুলতান আইয়ুবী পড়লেন আলী বিন সুফিয়ানকে নিয়ে। বললেন, 'আলী, দামেস্ক, মুসাল, হলব, ইয়েমেন এবং সমস্ত ইসলামী রাজ্যগুলোতে গুপ্তচর পাঠাও। দ্রুত তদন্ত করে সেখানকার সঠিক অবস্থা জেনে আসবে তারা। পারলে তুমি নিজেই এক চক্কর দিয়ে এসো দামেস্ক থেকে।'

এটা কোন সরকারী শুভেচ্ছা সফর ছিল না। আলী বিন সুফিয়ান বা তার নিয়োজিত গোয়েন্দাকে সে সব এলাকায় বহুরূপী সাজতে হবে, তদন্ত করতে হবে বিচিত্র এলাকায়।

প্রথমেই জানতে হবে, যে সকল শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, তারা কতটা অনড়, কতটা আবেগের বশে এ পথে পা বাড়িয়েছে। এরপর জানতে হবে, খৃস্টানদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক আছে কি নেই, থাকলে কতটা গভীর। খলিফার সৈন্য বাহিনীর সাথে তাদের মিল বা অমিল কতটুকু। জানতে হবে সৈন্যদেরকে এমন কাজে ব্যবহারের প্রস্তুতি আছে কিনা, যা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ও শত্রুদের জন্য লাভজনক?

আরও জানতে হবে, সে সকল অঞ্চলের জনমত কেমন? জনগণের আবেগ ও নীতি-বিশ্বাস কি রকম? এ সব অঞ্চলে ফেদাইনরা কতটা তৎপর?

এটাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সুলতান আইয়ুবী দামেস্ক অথবা কোন মুসলিম এলাকাতে সৈন্য সমাবেশ ও অভিযান চালালে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে?

১১৭৪ খৃস্টাব্দের মে মাসের দিনগুলো, মুসলিম জাহানের জন্য গভীর অন্ধকারময় দিন। নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃতদেহকে তখনও গোসলই দেয়া হয়নি, অনেকের মুখে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল। যাদের মুখে এ ঝিলিক দেখা গেল এরা কিন্তু কেউ খৃস্টান নয়, এরা সবাই মুসলমান। জঙ্গীর মৃত্যুতে এরা যেন খৃস্টানদের চেয়েও বেশী উৎফুল্ল। এরা সেই সব লোক, যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য ও পরগণার আমীর, জায়গীরদার বা শাসক। তারা সকলেই একত্রিত হয়েছে জঙ্গীর বাড়ীতে। তারা এসেছে তাঁর জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য।

জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য যারা এসেছে তাদের মধ্যে আরেকদল লোক ছিল, যাদের চেহারায় গভীর দু:খ ও বেদনা প্রকাশ পাচ্ছিল। জঙ্গীর মৃত্যুতে সত্যিকার অর্থেই তারা ছিল অস্থির ও বেদনাবিধুর। যারা উৎফুল্ল তাদের মধ্যেও এক ধরণের অধীরতা দেখা গেল, তাদের অধীরতার কারণ, সন্ধ্যার আগেই যেন দাফন-কাফন শেষ করা যায়।

জানাজায় বহু লোকই শরীক হয়েছিল বটে, তবে তাদের মন মানসিকতায় ছিল বিচিত্র অনুভূতি। তারা একে অন্যকে

সন্দেহের চোখে দেখছিল। যদিও তাদের ধর্ম এক, আল্লাহ এক, রাসূল এক, কোরআন এক এবং তাদের শত্রুও এক, তবু তাদের চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন ছিল না। এই জনসমুদ্রকে এমন এক গাছের সাথে তুলনা করা চলে, যে গাছের বিভিন্ন ডালপালা বৃক্ষের মূল কাণ্ড থেকে কেটে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে আর প্রতিটি ডালপালা নিজেকে এখন স্বাধীন মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

এ যুগটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে জায়গীরদারীর যুগ। কয়েকজন মুসলিম সুলতানের রাজ্য একটু বিস্তৃত ছিল, অন্যসব রাজ্যগুলো ছিল ছোট ছোট। এর শাসকদের বলা হতো আমীর। এ সকল আমীররা কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীন ছিল। ইসলামের যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে, আমীররা খলিফাকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতো। কিন্তু এ সাহায্য শুধু সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তার মধ্যে কোন জাতীয় চেতনাবোধ ও আবেগ থাকতো না। তারা বিলাস ও আরামের জীবন যাপনের জন্য ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চাইতো। প্রকাশ্যে এরা খলিফাকে সাহায্য করতো, আর গোপনে জাতীয় শত্রু খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আরাম আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করতো। এদের কেউ কেউ গোপনে শত্রুদের সাথে শান্তি চুক্তিও করে রাখতো।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর শাসনকাল খৃস্টানদের জন্য ছিল দুঃসহ আতঙ্কের। ইসলামী চেতনা বিনাশের যে কোন প্রচেষ্টাকেই তিনি রুখে দাঁড়াতেন। খৃস্টানদের সাথে সখ্যতা করার কারণে তিনি বহুবার মুসলমান ওমরাদের সতর্ক করেছেন। তাদের

তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন যে, খৃস্টানরা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। আমরা একতার বন্ধন ছিন্ন করলে তারা একে একে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

খৃস্টানদের আমদানী করা ইউরোপীয় মদ, মেয়ে ও সোনার টুকরোগুলোর এত শক্তি ছিল যে, তারপরও তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতো। নিজের বিবেক বুদ্ধিকে বন্ধক রেখে পাপের সাগরে ডুবে যেতো যখন তখন। কিন্তু জঙ্গীর সতর্কবাণী বার বার তাদের ফিরিয়ে আনতো চেতনার রাজপথে।

তারা 'মুসলমান' এটা তাঁদের বড় পরিচয় ছিল না, তাঁদের প্রথম পরিচয় ছিল তারা জায়গীরদার বা আমীর। তারপরে যদি ধর্মের পরিচয় প্রয়োজন হতো তবে তাঁরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত। তাঁদের দ্বীন-ধর্ম সব কিছুই ছিল তাদের রাজ্য, ক্ষমতা ও জায়গীরদারী। ক্ষমতার দম্ভই ছিল তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের বস্তু। ইসলামী চেতনা ও ঐক্যের প্রতি এদের কোন মমত্ববোধ ছিল না। যুদ্ধকে এরা ভয় পেতো, ঘৃণা করতো। তাদের বড় ভয়, যদি খৃস্টান শক্তি তাদের জায়গীরদারী কেড়ে নেয়! তারচে বড় ভয়, প্রজারা ইসলামের সঠিক চেতনায় উজ্জীবিত হলে তাদের অপকর্ম, অন্যায়, বিলাসিতা ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে যদি রুখে দাঁড়ায়! জনগণের মনে এ জাগরণ এলে তা ক্ষমতার জন্য বিরাট হুমকি হয়ে যাবে যে!

জঙ্গী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ ও সম্মান জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে বলে তারা জঙ্গীকে ভয় পেতো। জঙ্গীর সেনাবাহিনীতে যারা যোগ দেয় তারা তো তাদেরই প্রজা!

এই প্রজারা একবার রুখে দাঁড়ালে কি উপায় হবে তাদের!

প্রকৃত ইসলামী জযবা থাকার কারণে মুজাহিদরা দশগুণ শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেও ভয় পায় না। মুজাহিদদের এই জযবা আমীরদের কাছে ছিল অসহ্যের ব্যাপার! এ কারণেই তারা জঙ্গীকে এবং সুলতান আইয়ুবীকে একদম দেখতে পারতো না। জঙ্গী এখন শেষ। জঙ্গীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার জিহাদী জযবাও কবরস্থ হয়ে গেছে এ কথা মনে করেই তারা আজ খুশী।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর দাফন শেষ হয়েছে। মুসলমানদের ওপর খৃস্টানদের যে আতংক ছিল, সে আতংক আর নেই। এখন শুধু একটি কাঁটাই রয়ে গেছে, সে হলো সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তার ব্যাপারে খৃস্টানরা তেমন উদ্বিগ্ন নয়। কারণ এতদিন জঙ্গী ও আইয়ুবীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হয়েছে। এখন আইয়ুবী সম্পূর্ণ একা। তাকে সাহায্য করার জন্য জঙ্গী আর নেই। একা আইয়ুবী আর কতক্ষণ লড়বে, কতদিক সামলাবে?

খৃস্টানরা আনন্দিত এ জন্য যে, নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পরে তাঁর ওমরা ও উজিররা জঙ্গীর অল্পবয়স্ক শিশুসন্তান আল মালেকুছ সালেহকে সিংহাসনে বসিয়েছে। যার বয়স সবেমাত্র এগারো বছর। এটা তাদেরই কাজ, যারা গোপনে খৃস্টানদের বন্ধু ছিল! এভাবেই সুলতান জঙ্গীর গদী খৃস্টান ক্রীড়নকদের হাতে চলে গেলো।

এই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল গুনাশতগীনও, যিনি জঙ্গীর দূর্গের অধিপতি ছিলেন। আর ছিল মুশালের শাসক সায়ফুদ্দিন,

দামেস্কের হাকিম শামসুদ্দিন আব্দুল মালেক। আল জাজিরা ও আশেপাশের অঞ্চলের শাসনের কর্তৃত্ব ছিল নূরুদ্দিন জঙ্গীর ভাতিজাদের হাতে। এ ছাড়া ছোট ছোট আরও কিছু জায়গীরদার ছিল, যারা সকলেই সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। সুলতান বেঁচে থাকতে এরা প্রকাশ্যে খলিফার অধীন থাকলেও কার্যত: ছিল খৃস্টানদের বন্ধু।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুতে মুসলিম বিশ্বের যে ক্ষতি হয়েছিল, সে ক্ষতি নূরুদ্দিন জঙ্গীর স্ত্রী মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন। সুলতান আইয়ুবীও এই শূন্যতা অনুভব করছিলেন তীব্রভাবে। আর অনুভব করছিলেন তারা, যারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। জঙ্গীর শিশু পুত্র গদীনশীন হওয়ায় এরা সবাই ছিলেন সীমাহীন পেরেশানীর শিকার।

০

এই ঘটনার পর বেশ কিছু দিন অতীত হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী তাঁর কামরায় পায়চারী করছিলেন। কামরায় মোস্তফা জুদাত নামে জঙ্গীর এক উর্ধতন সামরিক অফিসার বসা। মোস্তফা জুদাত তুরস্কের অধিবাসী। তিনি নূরুদ্দিন জঙ্গীর সেনাবাহিনীর মেনজানিক বিভাগের ইনচার্জ ছিলেন। জঙ্গীর মৃত্যুর পর ইসলামী দুনিয়ার দূরাবস্থা লক্ষ্য করে তিনি সীমাহীন অস্থিরতায় পড়লেন। কি করে মিল্লাতকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করা যায় ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছিলেন না তিনি। প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগতে ভুগতে এক সময় তার মনে হলো, যদি কেউ জাতিকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে, তিনি একমাত্র আইয়ুবী। আইয়ুবীই পারেন এ সংকটময় মুহূর্তে ঝুঁকি

গ্রহণ করতে।

কালবিলম্ব না করে আইয়ুবীর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘদিনের ছুটি চাইলেন তিনি। কয়েক বছর দেশে যাননি বলে সহজেই তার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। তিনি তাঁর দেশ তুরস্কে যাওয়ার কথা বলে দামেস্ক ত্যাগ করলেন। কিন্তু দামেস্ক থেকে বেরিয়েই তিনি সোজা চললেন কায়রোর অভিমুখে। সুলতান আইয়ুবীর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

মোস্তফা জুদাত ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক সেনা অফিসার। তার কাছে নূরুদ্দিন জঙ্গীর পরে সুলতান আইয়ুবী ছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার উপযুক্ত সেনাপতি আর কেউ ছিল না। তাঁর ধারণা, জঙ্গীর অবর্তমানে মিল্লাতের যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে আইয়ুবী তা পুরোপুরি অবহিত নন। এ জন্য তিনি দেশে না গিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে সামগ্রিক অবস্থা জানানোর জন্য কায়রো ছুটে আসেন।

'আর সেনাবাহিনী এখন কি অবস্থায় আছে?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।

'মুহতারাম, সুলতান জঙ্গী সেনাবাহিনীতে যে আবেগ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে গেছেন, সে প্রেরণা এখনও টিকে আছে। কিন্তু এই আবেগ আর বেশীদিন টিকে থাকবে বলে মনে হয়না। আপনি ভাল মতই জানেন, খৃস্টানদের প্লাবন বাঁধের মত ঠেকিয়ে রেখেছে শুধু সেনাবাহিনী। মুহতারাম জঙ্গীর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা সবই ছিল সামরিক বাহিনীর পরামর্শের ভিত্তিতে। কিন্তু এই পদক্ষেপ বর্তমান খেলাফতের কার্যবিধির পরিপন্থী। আমরা এখন আমাদের নিজ সিদ্ধান্তে কোন কিছু করতে

পারিনা। খলিফা যদি আমাদের যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে রাখে তবে সামরিক বাহিনীর কিছুই করার নেই।

খৃস্টানরা ভালমতই জানে, মুসলমান আমীরদের মধ্যে সে চেতনাবোধই নেই, যে চেতনা থাকলে মানুষ জেহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে। জনগণ কার পেছনে দাঁড়িয়ে কিসের প্রেরণায় জীবন কোরবানী করবে? খৃস্টানরা মুসলিম শাসক ও আমীরদের ক্রয় করে নিয়েছে। এখন তারা সেনাপতিদের পিছনে লেগেছে। সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের ক্রয় করার জন্য হেন চেষ্টা নেই যা তারা করছে না। তাদের এ অপতৎপরতা আমাদের সামরিক বিভাগ ও জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলবে। যদি অচিরেই এসব বন্ধ করা না যায়, তবে খৃস্টানরা সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই মুসলিম জাহানের মালিক হয়ে যাবে। সমস্ত মুসিলম জাহান তাদের তাবেদারে পরিণত হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আমীরদের আর সঠিক পথে আনা সম্ভব নয়। তারা খৃস্টানদের মদের নেশায় ডুবে আছে।

এইসব আমীরদের পিছনে এখন তারা মেয়েও লেলিয়ে দিয়েছে। আপনি শুনে অবাক হবেন, খৃস্টান সুন্দরী ললনারা এখন আমীরদের বাসায় বাসায় আস্তানা গেড়ে বসেছে। তাদের চাহিদা মত মহলে আনন্দ উৎসব হয়। সে উৎসবে বিশিষ্ট সামরিক অফিসারদের দাওয়াত করা হয়। আর তাদেরকে এই মেয়েরা ফাঁদে ফেলে বিনষ্ট করার চেষ্টা চালায়।' থামলেন মোস্তফা জুদাত।

'তারপর কি হবে আমি বলছি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন 'সৈন্যদের নেশাগ্রস্ত ও ব্যভিচারে অভ্যস্ত বানানো হবে।'

'অলরেডী বানানো হচ্ছে!' মোস্তফা বললেন, 'এখন তাদের নিয়মিত হাশিস সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয়, এরপরও যে সব সেনাপতি ও কমাণ্ডার খৃস্টানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, আর জিহাদের প্রেরণা ধরে রাখবে অন্তরে, তাদেরকে পেশাদার খুনী দিয়ে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনাও আছে তাদের।'

মোস্তফা সুলতান আইয়ুবীকে আরো বললেন, 'যে সব আমীররা খেলাফতের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসন চালানোর জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, খৃস্টান গোয়েন্দারা তাদের মনে বুনে দিচ্ছে উচ্চাশার বীজ। ইন্ধন জোগাচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণের। আশ্বাস দিচ্ছে সাহায্য সহযোগিতার। ফলে এক আমীর অন্য আমীরকে শত্রু ভাবতে শুরু করেছে। একে অন্যের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলছে। খৃস্টানরা এই বিভেদ বাড়িয়ে তোলার জন্য ঠিক মত হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে কামড়াকামড়ি শুরু হলে সাহায্যের বাহানায় সৈন্য পাঠিয়ে এক সময় অবলীলায় সুযোগ বুঝে গ্রাস করে নেবে উভয়ের এলাকা। এমনি নানা কূটকৌশল ও চক্রান্তে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ফলে অবস্থা খুবই নাজুক।'

'আমাকে সঠিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আপনি খুব সময়োচিত উপকার করেছেন।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আপনি না এলে এসব সঠিক তথ্য থেকে আমি বঞ্চিত থাকতাম।'

'তথ্য পাওয়াটাই বড় কথা নয় সুলতান! এখন প্রয়োজন দ্রুত এ্যাকশান। যদি আপনি ত্বরিৎ কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ

হন, তবে মনে করে রাখবেন, ইসলামী সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবে যাবে আপনার চোখের সামনে। সুলতান! নিরব দর্শকের ভূমিকা পালনের কোন অবকাশ নেই এখন। এখন প্রয়োজন, জঙ্গীর মত দুঃসাহসী পদক্ষেপের।'

সুলতান আইয়ুবীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো একরাশ বেদনামাখা দীর্ঘশ্বাস, 'হায়! আমাকে এমন দিনও দেখতে হলো, ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে! আমার শুধু ভয়, আমার মৃত্যুর পর বিশ্বাসঘাতকরা ইতিহাসের পাতায় না লিখে রাখে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী।'

'যদি আপনি এই ভয়ে কায়রোতে বসে থাকেন, তবে ইতিহাস আপনার ওপর এই অভিযোগ পেশ করবে যে, সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর খবর শুনে সুলতান আইয়ুবীও পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তার শিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হতো তা পানি হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুর অধিক নির্জীব হয়ে গিয়েছিলেন। মিশরের উপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যকে কোরবানী দিতেও প্রাণে বাঁধেনি তার।'

'হ্যাঁ! তুমি ঠিকই বলেছো মোস্তফা।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এই অভিযোগটি হবে অতিশয় নিকৃষ্ট ও লজ্জাকর। আমি চিন্তা করে দেখলাম, আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হয়ে এটা দেখার বিষয় নয় যে, আমার ঘোড়ার পদতলে আল্লাহর কোন দুশমন পিষ্ট হলো। আমার দৃষ্টিতে কালেমা পড়া দুশমন কাফেরের চেয়েও জঘন্য। আর কালেমা পড়া দুশমন

তারাই, যারা নিজের স্বার্থে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রাখে।'

সুলতান আইয়ুবী মোস্তফা জুদাতকে বললেন, 'আপনি আবার দামেস্ক ফিরে যান। সেখানে আমি আলী বিন সুফিয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মনে রাখবেন, তিনি সেখানে গোয়েন্দা বেশে গিয়েছেন। সেখানে কেউ জানতে পারবে না, আলী বিন সুফিয়ান তাদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে ও সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। সেখানে কেমন তৎপরতা চলছে আর কেমন তৎপরতা চালানো উচিত সবই সে লক্ষ্য করছে। আপনি গিয়ে খোঁজ নিন, কোন্ কোন্ সেনাপতি ও কমাণ্ডার সন্দেহজনক।

আমি এরই মধ্যে সকল আমীরদের কাছে পয়গাম পাঠিয়েছি, হে আমীর! এই সংকটময় অবস্থায়, যখন খৃস্টানরা মাথার ওপর চড়ে আছে, তখন আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে তার প্রতিরোধকল্পে নিজেদের মধ্যকার সব বিরোধ মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয় না, তারা আমার চিঠিকে আমল দেবে। কিন্তু তাদেরকে সরল ও সঠিক পথে চলার শেষ সুযোগটুকু দিতে চাই আমি। যদি তারা আমার এ আবেদনে সাড়া না দেয় তবে এ নিয়ে আমি আর তাদের একটি কথাও বলব না। তখন আমি কি পথ বেছে নেব সে কেবল আমিই জানি।'

মোস্তফা জুদাতকে বিদায় করে সুলতান আইয়ুবী তাঁর দারোয়ানকে ডেকে কয়েকজন সেনাপতি ও সভাসদের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'তাদেরকে খুব জলদি আমার কাছে ডেকে আনো।'

এরা সবাই ছিলেন কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের সদস্য।

o

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দক্ষিণ হস্ত, সহকর্মী এবং বন্ধুও। তিনি মজলিশে শুরার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আল্লাহতায়ালা ইস্পাত দৃঢ় চির যৌবন দান করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন সুদৃঢ় ছিল, পাহাড় সমান আঘাতও তিনি হাসিমুখে সহ্য করতে পারতেন। তিনি ছিলেন সংকল্পে দৃঢ়, দূরদর্শী এবং দুঃসাহসী। আমীর গরীব সকলকেই তিনি সমান ভাবে ভালবাসতেন, উপযুক্ত মর্যাদা দিতেন, যথাযথ সম্মান করতেন।

যারা তার পাশে থাকতেন তারা সবাই তাঁর দৃঢ়তা ও ভালবাসায় সিক্ত হতেন। সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে তাঁর দৃঢ়তা দেখে শত্রুর ওপর প্রবল বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়তো। একদিনের ঘটনা, তাঁর এক চাকর অন্য চাকরের সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে তাকে জুতা ছুঁড়ে মারলো। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তখন কামরা থেকে বেরুচ্ছিলেন, জুতা গিয়ে লাগলো তাঁর গায়ে। দুই চাকরই থর থর করে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু সালাহউদ্দিন তাদের কিছুই না বলে অন্যদিকে মুখ করে বের হয়ে গেলেন। তাঁর এ ধরনের মহানুভবতার জন্যই কেবল বন্ধু নয় শত্রুও তার সংস্পর্শে এলে ভক্ত মুরীদ হয়ে যেতো।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যু ইসলামী সালতানাত জুড়ে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সেই বিপর্যয়ের সবচে ভয়ংকর দিক ছিলো, সালতানাতের গভর্ণর ও উজিররা খৃস্টানদের বন্ধু ও ইসলামের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তখন ঝুঁকি

মুক্ত ছিল না। এ অবস্থায় সুলতান আইয়ুবীর পক্ষে মিশর ত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। মিশরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দাবী ছিল, ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার চিন্তা অন্তর থেকে মুছে দিয়ে মিশরের প্রতিরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়া।

কিন্তু আইয়ুবী এসব কিছুই চিন্তা করলেন না। তিনি আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'যদি আমি ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেই, তবে আমাকে কাল কেয়ামতে হাশরের ময়দানে খৃস্টানদের সাথে উঠানো হবে।'

ইসলামের হেফাজত ও উন্নতিকে তিনি আল্লাহতায়ালার আদেশ ও ফরমান মনে করতেন। তিনি নিজেকে কখনও একজন শাসক ও আমীর মনে করতেন না। আমার স্মৃতিতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর যৌবনকাল স্পষ্টভাবে গাঁথা আছে। তখনো তিনি নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেননি। আরাম ও বিলাসিতায় পূর্ণ মাত্রায় ডুবে থাকতেন।

কেউ এটা চিন্তাও করেনি, তার এ যৌবনের উন্মাদনা কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এবং তিনি ইসলামের এক নিঃস্বার্থ খাদেম হয়ে যাবেন। তিনি হবেন ইসলামের বিশ্ব বরেণ্য নেতা এবং শত্রুর জন্য ভয়ংকর এক তুফান।

তিনি তাঁর চাচার সঙ্গে প্রথম খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। এই প্রথম যুদ্ধেই তিনি সকলকে অভিভূত করে দেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে প্রথমেই বিলাসিতা ও আনন্দ স্ফূর্তির উপকরণে পদাঘাত করলেন আর সমস্ত জীবন ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। তিনি মিল্লাতে ইসলামিয়াকে বললেন, 'এ তামাম দুনিয়া আল্লাহর। আল্লাহর এ

দুনিয়ায় আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের। আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজেকে দাবী করার পর কেউ যদি এ দায়িত্ব পালন না করে তবে হিসাবের দিন আল্লাহ কাউকে ছাড়বেন না।'

তাঁর এই পরিবর্তিত অবস্থা দেখে বুঝারই উপায় ছিল না, তিনি জীবনে কখনো বিলাসপরায়ন ছিলেন। নফসের উৎকর্ষ সাধনের মাঝেই নিহিত থাকে মানুষের কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও নৈপূণ্য। নফসের খাহেশকে কোরবানী দিয়েই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে। মানুষ যখন নফসের দাবীকে অগ্রাহ্য করতে পারে তখনি সে হাসিল করে ইনসানিয়াত ও কামেলিয়াত। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এই কামেলিয়াত ও ইনসানিয়াত হাসিল করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর চরিত্রে পরিপক্কতা ও নৈপূণ্য এসেছিল।

তিনি বন্ধু মহলে প্রায়ই বলতেন, 'আমাকে কাফেররাই মুসলমান বানিয়েছে। যদি আমরা আমাদের যুবকদেরকে, যারা ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের বিবেকের সামনে কাফেরদের ভণ্ডামী ও নষ্টামী তুলে ধরতে পারি, তবে তাদের বিবেকই তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে দেবে।'

তিনি বলতেন, 'আমি আমার জাতিকে রাসূলের সেই হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তুমি নিজেকে ভালমত চিনে নাও, তুমি কে ও কি? আর দুশনকেও ভাল মত চিনে নাও, সে কে ও কি? এবং সে তোমার সম্পর্কে কি ধারণা রাখে?'

শত্রুরাই তাঁর কর্মের গতি ও মোড় পরিবর্তন করে

দিয়েছিল। সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবী তাঁর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সংকল্পে শেষ পর্যন্ত নিমগ্ন ও অটুট ছিলেন। তিনি কখনো নিজেকে ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা ভাবেননি, ভাবেননি তিনি মিশরের আজীবন শাসক। জিহাদই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। যুদ্ধ ও সমর কৌশলে তিনি এমন উস্তাদ ছিলেন যে, খৃস্টান কমাণ্ডররা সম্মিলিতভাবে তাঁর ভয়ে ভীত থাকতো। জিহাদে তিনি এমনভাবে নিমগ্ন ছিলেন, জীবনে তিনি হজ্জ করারও অবসর পাননি। জিহাদ সে সুযোগ তাঁকে দেয়নি।

শেষ জীবনে তাঁর এই একটি আশা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হজ্জ করতে যাবেন। কিন্তু তখন তাঁর কাছে হজ্জ করার মত অর্থ ছিল না। যখন তিনি ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর নিজস্ব সম্পদ ছিল মাত্র ৪৭ দেরহাম রৌপ্য আর এক টুকরো সোনা। তাঁর সম্পত্তি বলতে ছিল শুধুমাত্র একটি বাড়ি, যে বাড়িটি তিনি পৈতৃকসুত্রে পেয়েছিলেন। সুলতান আইয়ুবীর বাস্তব জীবনের এ এক বিস্ময়কর সততার নমুনা। অর্থ সম্পদের মোহকে তিনি ইসলামের সৈনিকদের জন্য গযব মনে করতেন। সম্পদের কালিমা থেকে আশ্চর্যরকম ভাবে মুক্ত ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ইসলামের জন্য স্বর্ণালী ভবিষ্যত নির্মাণ করা।

•

সুলতান আইয়ুবী তাঁর পারিষদবর্গ, সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর অফিসার ও মিশরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভা আহবান করলেন। সবাই দরবার কক্ষে উপস্থিত হলে সুলতান আইয়ুবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বন্ধুগণ! জাতির এক

সংকটময় মুহূর্তে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সুলতান জঙ্গীর অবর্তমানে ইসলামী সালতানাত আজ যে গভীর সংকটে পড়েছে সে ব্যাপারে কম বেশী আপনারা সকলেই অবগত আছেন। জাতির প্রতিটি জটিল অবস্থায় আপনারা আমার পাশে ছিলেন। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই আমরা সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি, আজও সেই আশা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি।

বন্ধুগণ!

আজ এমন এক সংকটময় অবস্থা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যে অবস্থার মোকাবেলা করা আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু আমরা যদি এই অবস্থার মোকাবেলা করতে না পারি, তবে আমাদের সকলের জন্যই দুনিয়া হবে লাঞ্ছনাময় আর আখেরাতে আল্লাহর দরবারে আমরা হবো চরম অপমানিত!

ইসলামের ইতিহাস এ দুনিয়াতে আমাদের কবরের ওপর অভিশাপ দেবে, আর হাশরের দিনে সেই শহীদগণ, যারা ইসলামের গৌরব ও ইজ্জত রক্ষার্থে জীবন কোরবানী করেছেন, তারা আমাদের লজ্জিত করবে। এখন আমাদের সামনে সেই সময় এসেছে, যখন আমাদেরও জীবন কোরবানী করা ফরজ হয়ে গেছে।'

এ ভূমিকার পর তিনি সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরে বললেন. 'এখন সময় দাবী করছে নিজের ভাইদের সাথে যুদ্ধ।'

এটুকু বলে তিনি সামান্য চুপ করলেন এবং সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আইয়ুবীর কাছ থেকে বিশদ বর্ণনা শুনে সকলের মুখের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রতিটি

চেহারায় খেলা করতে লাগল দৃঢ়তার অমল বিভা।

কয়েকজন দাঁড়িয়ে বললো, 'জিহাদের ময়দানে আপনি কখনো আমাদের পেছনের সারিতে পাবেন না। যতদিন আপনি ইসলামের জন্য লড়াই করবেন, ততদিন আপনি আমাদেরকে আপনার পাশে পাবেন।'

তিনি বুঝতে পারলেন উপস্থিত সকলেই সর্বাবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

এবার তিনি বললেন, 'এ জন্য আমি প্রথমেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই। কারণ কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীনে থেকে কোন বিপ্লবী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। সে অনুমতি কেন্দ্র আমাকে দেবে না। কিন্তু আপনাদের অনুমতি ছাড়া এই সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি না। ভেবে দেখুন, বর্তমান খলিফা মাত্র এগারো বছরের এক বালক। তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তিন চারজন ওমরা। আর এই ওমরারা সবাই খৃস্টানদের বন্ধু! এ কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, খেলাফত এখন খৃস্টানদের কোলে রয়েছে।

সুতরাং এখন আমাদের প্রথম সংঘর্ষ খেলাফতের বিরুদ্ধে। যদি আমরা স্বাধীন না হই, তবে আমাদের খলিফার আদেশ ও শাসন মানতে হবে। আর এ আদেশ ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য হবে ধ্বংসাত্মক ব্যাপার! এ সংকটময় অবস্থায় এ পদক্ষেপই কি সঠিক নয়, প্রথমে মিশরকে খেলাফতের আওতা থেকে মুক্ত করে নেই? এরপর আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবো, ইসলামের স্থায়িত্বের জন্য আমরা কি করবো?'

'আপনি কি খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চান?'

এক সেনাপতি প্রশ্ন করলো।

'এখনও সে সিদ্ধান্ত নেয়নি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই আমার দূত বিভিন্ন রাজ্যগুলো থেকে ঘুরে আসবে। সালতানাতের অধীন সব আমীরের কাছেই দূত পাঠিয়েছি আমি। ওরা এলেই বুঝবো, আমাদের যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে কিনা।'

'আপনি মিশরকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করুন।' এক অফিসার বললো, 'আমরা এগারো বছরের শিশুকে খলিফা মেনে নিতে পারি না।'

'তবে কি তোমরা আমাকে মিশরের সুলতান মেনে নিচ্ছো?' আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।

উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমরা আপনাকে মিশরের সুলতান মেনে নিলাম। আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্তে আপনার পাশে থাকার ওয়াদা করলাম।'

সে অনুষ্ঠানেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশরকে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি ওয়াদা করছি, যতদিন মিশরের জনগণ আমাকে ইসলামের খাদেম মনে করে কেবল ইসলামের জন্যই আমার আনুগত্য করবে ততদিন আমি তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করে যাবো। আমি কোনদিন নিজেকে বাদশাহ মনে করিনি, এখনো করি না, আর কোনদিন যেন ক্ষমতার মোহ আমাকে পেয়ে না বসে সে জন্য আল্লাহর কাছে মদদ চাই। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ইসলামের মঙ্গলের জন্য হয় এ ব্যাপারে

আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা চাই।'

সুলতান আইয়ুবী আরো বললেন, 'আমি খৃস্টান বাহিনীর বিশালতা দেখে ভয় পাই না। দশজন জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে দশ হাজার শত্রুর মোকাবেলা করতে আমার বুকে বিন্দুমাত্র কাঁপন জাগবে না। কিন্তু আমার ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা যখন চিন্তা করি তখন যুদ্ধের সমস্ত কৌশল আমার মাথা থেকে হারিয়ে যায়। আমার তলোয়ার খাপ থেকে মুক্ত হতে চায় না। আফসোস! আমাদেরকে আজ ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। আমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবো আর খৃস্টানরা তামাশা দেখবে, এরচে বদনসীব আমাদের জন্য আর কি হতে পারে!'

'যতই দুঃসহ হোক, এ পথে আমাদের পা বাড়াতেই হবে সুলতান!' একজন সেনাপতি বললেন, 'যখন কথার প্রভাব বা উপদেশে কাজ হয় না, তখন শক্তি প্রয়োগ করতেই হয়। ইসলামের ঘরে যদি আপন ভাইও আগুন দিতে আসে, তাকে প্রতিহত না করলে সে ঘর তেমনি পুড়বে, যেমন পুড়তো শত্রু আগুন দিলে। আপনি জানেন, আমাদের মধ্যে কেউ খেলাফতের গদীর লালসা করে না। আমরা যা কিছু করবো তা ইসলামের জন্যই করবো, নিজের স্বার্থে নয়।'

○

সুলতান আইয়ুবী দামেস্ক, হলব, মুসালে এবং আরো যে সব জায়গায় দূত পাঠিয়েছিলেন, সকলেই ফিরে এলো। সুলতানের সতর্কবানীকে কোন আমীরই আমল দেয়নি, কেউ গ্রহণ করেনি তাঁর পয়গাম। কেউ কেউ তামাশা করেছে,

কেউবা করেছে উপহাস। দামেস্কের দূত জানালো, 'খলিফা আপনার পয়গাম পড়েও দেখেননি। যাদের হাতের তিনি পুতুলমাত্র, যারা তাকে খলিফা নিযুক্ত করেছে এবং গদীতে বসিয়েছে, সেই আমীররা আপনার পয়গাম পড়ে হাসাহাসি করেছে, কানাঘুষা করেছে।

একজন বলেছে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাহানা করে সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলোকে নিয়ে অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখছে। আর তা সফল হলে তিনিই হবেন সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি।

অন্য এক আমীর এগারো বছরের খলিফাকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বলেন, আপনি আইয়ুবীকে জানিয়ে দিন, যুদ্ধ করা ও না করার এখতিয়ার শুধু খলিফার উপরই ন্যাস্ত। যদি আইয়ুবী আপনার আদেশ অমান্য করে, তবে আপনি তাকে বরখাস্ত করে মিশরের শাসনভার অন্য কারো হাতে অর্পণ করুন।'

বালক খলিফা দূতকে এই আদেশই দিলেন আর বললেন, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বলবেন, তিনি যেন আমার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করেন। ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজন আছে কি নেই এবং সালতানাতের প্রয়োজনে এখন কি করা দরকার সে চিন্তা আমি করবো।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে মরহুম জঙ্গীর প্রেরিত অনেক সৈন্য ছিল। এক আমীর সে কথা স্মরণ করিয়ে খলিফাকে বললো, 'তাঁকে আদেশ করুন, তিনি যেন আমাদের সব সৈন্য ফেরত পাঠিয়ে দেন। খলিফার হুকুম ছাড়া ইচ্ছামত

সেনাবাহিনী ব্যবহার করার অনুমতি নেই কোন রাজ্যের।'

খলিফা দূতকে বললো, 'খেলাফতের তরফ থেকে যে সব সৈন্য আইয়ুবীর কাছে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে বলবে।'

দূত খলিফার দরবার থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে এমন সময় অন্য এক আমীর বললো, 'আর শোন, আইয়ুবীকে বলবে, আগামীতে খলিফার কাছে এ ধরনের কোন প্রস্তাব পাঠানোর যেন সাহস না করে।'

দূতরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে, তাতে সুলতান আইয়ুবীর চেহারায় কোনই ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি আলী বিন সুফিয়ানের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আলীকে তিনি গোপনে দামেস্ক পাঠিয়েছিলেন।

সুলতানের গোয়েন্দারা বণিকের বেশে কাফেলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বিভিন্ন রাজ্যে। আলীর মতো তারাও অনেকে ফিরে আসেনি। সুলতান তাদেরও ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিলেন।

সুলতান আইয়ুবীর বিস্ময়কর সাফল্যের গোপন রহস্য ছিল, তিনি কখনো অন্ধকারে পথ চলতেন না। কোথাও যাওয়ার দরকার হলে গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে সেখানকার অবস্থা ও পরিস্থিতি, অসুবিধা ও ভীতির কারণগুলো আগেই জেনে নিতেন। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগও ছিল একটু ব্যতিক্রমধর্মী। তারা যেমন ছিল বিশ্বস্ত তেমনি চৌকস। তাদের কেবল গোয়েন্দাগিরিই শেখানো হতো না, বরং ছদ্মবেশ ও অভিনয়ে তারা যেমন নিপূণ হতো তেমনি গেরিলা যুদ্ধ বা কমাণ্ডো

লড়াইয়েও হতো অসম্ভব পারদর্শী। এ জন্য তাদেরকে বলা হতো লড়াকু গোয়েন্দা। খালি হাতের যুদ্ধেও তারা ছিল খুবই দক্ষ।

আলী বিন সুফিয়ানকে আল্লাহ গোয়েন্দাগিরি ও তথ্য অনুসন্ধানের নৈপূণ্য দিয়েই সৃষ্টি করেছিলেন। সুলতানের নির্দেশে তিনি যখন তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তখন বাহিনীকে তিনি বললেন, 'অন্যান্য বারের চাইতেও এবার তোমাদের বেশী সতর্ক থাকতে হবে, নির্ভুল তথ্য আনতে হবে। তোমাদের দেয়া রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এবার সুলতান যে পদক্ষেপ নেবেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের স্থায়িত্বের জন্য এই অভিযানের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে তোমাদের সঠিক তথ্যের ওপর।'

o

আলী বিন সুফিয়ান কায়রো থেকে রওনা হচ্ছেন। যাওয়ার সময় কমাণ্ডো অভিযানে দক্ষ একশো লোককে বাছাই করলেন তিনি। তাদের বললেন, 'ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের জান কোরবান করার জন্য বাছাই করা হয়েছে তোমাদের।'

তিনি সেই একশো গোয়েন্দাকে ব্যবসায়ীর পোষাকে সজ্জিত করলেন। আলী বিন সুফিয়ান নিজে এক বুড়ো ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কাফেলার সরদার সাজলেন।

এই বাণিজ্য মিশন উটের ওপর বিভিন্ন প্রকার পণ্য ও সরঞ্জাম বোঝাই করলো। এসব পণ্যসামগ্রী দামেস্ক ও অন্যান্য বাজারে বিক্রি করে তার পরিবর্তে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করবে। মাল সামান নেয়ার জন্য সঙ্গে নিল অনেক

উট ও ঘোড়া। এসব সরঞ্জামের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে রাখলো অস্ত্রশস্ত্র, তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদি। এমনকি বারুদ এবং আগুন ধরানোর যন্ত্রও। এই কাফেলা গভীর রাতে কায়রো থেকে রওনা হলো এবং সূর্য উঠার আগেই কায়রো থেকে বহু দূরে চলে গেল।

পথে একবার সামান্য বিশ্রাম নিয়েই কাফেলা আবার রওনা হলো। আলী বিন সুফিয়ানের ইচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি মঞ্জিলে পৌঁছা। সারাদিন একটানা পথ চললো কাফেলা। সূর্য ডুবে গেল, তবুও তিনি থামলেন না। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল, কাফেলা তবু এগিয়েই চলেছে। শেষে অনেক রাতে কাফেলাকে থামতে বললেন তিনি।

জায়গাটি চমৎকার। শস্য-শ্যামল অঞ্চল। বুঝা যায়, এখানে পানির কোন অভাব নেই। একটু দূর থেকে শুরু হয়েছে উঁচু নিচু পাহাড় ও পার্বত্য এলাকা। কাফেলা বিশ্রামের জন্য এখানেই অবস্থান নিলো।

কাফেলার সবাই বণিকের বেশে থাকলেও আসলে তো সকলেই সৈনিক। তাই তাদের চলাফেরায় ছিল ডিসিপ্লিন। ছিল সৈনিকসুলভ সাবধানতাও। উট এবং ঘোড়াগুলোও ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। মনে হলো তারাও সজাগ, সতর্ক।

আলী বিন সুফিয়ান পাহাড়ের কোল বা টিলার দিকে না গিয়ে বাইরে খোলা মাঠেই ক্যাম্প করলেন। সামরিক কৌশল ও নিয়ম অনুসারে দু'জনকে পাঠানো হলো পানির অনুসন্ধানে। বিশ্রামের জন্য থামলেও কেউ অস্ত্র ত্যাগ করলো না, কারণ সে সময় সফরে দু'ধরনের ভয় দেখা দিত। একদিকে মরুভূমির

বেদুঈন ডাকাতদের ভয়, অন্যদিকে খৃস্টান লুটেরা বাহিনীর আক্রমণের ভয়। মোটের ওপর এরাও ডাকাতই ছিল, তবে তারা শুধু মুসলমান কাফেলায় ডাকাতি করতো।

দুই সঙ্গী পানির উৎস খুঁজতে খুঁজতে বেশ দূরে চলে গেল। এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতেই তাদের নজরে পড়লো মশালের আলো। দূর থেকে আলো লক্ষ্য করে তাঁরা সেদিকে আরও একটু এগিয়ে গেল। শেষে কাছাকাছি এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেললো নিচে। জায়গাটি খুবই সুন্দর, দৃষ্টি নন্দন। সমতল ভূমিতে শস্য ক্ষেত ও খেজুরের বাগান। সেখানে পানিও আছে।

পানির কূপ থেকে সামান্য দূরে দু'টি মশাল আলো ছড়াচ্ছে। সেই আলোতে দেখা গেল, সাতজন পুরুষ ও চারজন মেয়ে আগুন জ্বালিয়ে বসে বসে সে আগুনে মাংস ঝলসে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাশ থেকে পেয়ালা তুলে চুমুক দিচ্ছে তাতে, মনে হয়, শরাব পান করছে।

একটু দূরে ঘোড়া ও তিন চারটি উট বাঁধা। তাদের পাশে স্তুপ হয়ে আছে জিনিসপত্র। আলী বিন সুফিয়ানের দুই সঙ্গী অতি সংগোপনে পা টিপে টিপে চলে এলো তাদের কাছাকাছি। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শুনতে লাগলো ওদের কথাবার্তা। রাতের নিস্তব্ধতার কারণে ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল এবং বুঝাও যাচ্ছিল। মেয়েদের নির্লজ্জ হাসি ঠাট্টাই বলে দিল, তারা মুসলমান নয়। তাদের সব কথাই ছিল রঙ্গ তামাশা ও হাসি ঠাট্টার। লোক দু'জন আর দাঁড়ালো না, ফিরে এসে আলী বিন সুফিয়ানকে খুলে বললো সব কথা।

আলী বিন সুফিয়ান কালবিলম্ব না করে সেখানে ছুটে গেলেন এবং খুব কাছ থেকে তাদের দেখলেন। লোকগুলোর ভাষা স্থানীয় আরবদের মত ছিল না। তাদের ভাষার টান থেকেই আলী বুঝতে পারলেন, এরা খৃস্টান।

আলী বিন সুফিয়ান একবার চিন্তা করলেন এদের সামনে গিয়ে হাজির হবেন কিনা, জিজ্ঞেস করবেন কিনা ওরা কারা, কোত্থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে? তার সাথে আছে একশো লড়াকু সৈনিক, ওরা মাত্র এগারোজন, অতএব ভয়ের কোন আশংকা নেই।

তিনি টিলার উপর এক ঝোপের আড়ালে বসে তাদের গতিবিধি গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর সন্দেহ হলো, এরা খৃস্টান গোয়েন্দা নয়তো! কোন মুসলিম রাষ্ট্রে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে যাচ্ছে নাতো এরা?

তিনি লোকগুলোর আরও কাছে যাওয়ার জন্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, হঠাৎ নিচের দিকে টিলার গোড়ায় দু'জন লোককে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি। লোক দু'জন তাঁর ঠিক বরাবর নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথা ও মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। টিলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওরা মেয়েদের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে।

মুখোশধারী লোক দু'জন ছিল মরুভূমির ডাকাত। তাদের দৃষ্টি মেয়েগুলোর দিকে। আলীর কাছ থেকে খুব বেশী দূরে নয় ওরা। ফিসফিস করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। আলী কান পাতলো।

'তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র আছে মনে হয়।'

'হ্যাঁ!' অন্যজন বললো, 'আমি তাদের তলোয়ার দেখেছি। মনে হয় এরা সবাই খৃষ্টান।'

'খৃস্টান হোক আর যে-ই হোক, এরা কোন সাধারণ অভিযাত্রী নয়।'

'ঠিক আছে, আগে ওদের শুয়ে পড়তে দাও। পরে দেখবো এরা কতটা অসাধারণ।'

'তা ঠিক, শুয়ে পড়ার পর এদের পাকড়াও করা কোন ব্যাপারই না।'

'আরে! পাকড়াও করার দরকার কি? ঘুমানোর পর ওদের শেষ করে মেয়েদেরকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নেবো।'

'ঠিক আছে, চলো সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'চলো।'

ডাকাত দু'জন সঙ্গীদের ডাকতে চলে গেল। আলী বিন সুফিয়ান চুপিসারে তাদের পিছু নিল। কিছু দূর গিয়ে তারা উল্টো দিকের পথ ধরলো। দু'তিনটি টিলা পার হয়ে আলী দেখলো সামনে ডাকাতদের ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ওরা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আলী বিন সুফিয়ানের কাফেলা ছিল বিপরীত দিকে। তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন, এখন তিনি কি করবেন? তিনি কি ক্ষুদ্র কাফেলাটিকে সতর্ক করবেন আগে, নাকি নিজের কাফেলায় ফিরে যাবেন? গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তিনি নিজের কাফেলায় ফিরে এলেন।

বিশজন কমাণ্ডোকে অস্ত্রসজ্জিত করে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন আগের জায়গায়। তাদেরকে বিভিন্ন পজিশনে দাঁড়

করিয়ে ভালমত বুঝিয়ে বললেন, তাদের কি করতে হবে। এরপর ডাকাতদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তার জানা ছিল না ডাকাত দল কখন আসবে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাদের সবাই শুয়ে পড়েছে। শুধু এক লোক বর্শা হাতে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার পাহারার ধরণ দেখেই বুঝা গেল, এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তখনও মশালও জ্বলছে। আলী তাকিয়ে রইলেন মশালের সে আলোর দিকে।

০

অপেক্ষা করতে করতে আলীর লোকজন অস্থির হয়ে পড়ল। ডাকাতদের আসার কোন নাম নেই। চিন্তায় পড়ে গেল আলী, তবে কি ডাকাতরা আসবে না? শুধু শুধু রাতভর কমাণ্ডোদের কষ্ট দিলেন তিনি! নাকি এটা কোন ফাঁদ!

ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। টিলার ভেতর দিয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো। আলস্য ঝেড়ে টানটান হয়ে গেল কমাণ্ডোদের পঞ্চেন্দ্রিয়। সতর্কভাবে নিজ নিজ অবস্থানে পজিশন নিল তারা।

মেয়ে এবং লোকগুলো তখনো ঘুমিয়ে। শুধু পাহারাদারের পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে। দ্বিতীয় জনের হাতে দায়িত্ব দিয়ে প্রথম জনও ঘুমিয়ে পড়েছে। এসে পড়েছে ডাকাত দল।

টিলার ওপর থেকে আলী ও তাঁর সঙ্গীরা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আট-নয়জন ডাকাত টিলার কোল ঘেঁষে সেই ঘুমন্ত মেয়েদের কাফেলার কাছে পৌঁছে গেল। ডাকাতদের দেখেই ভয় পেয়ে প্রহরী চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকতে লাগলো। ধরমড়িয়ে উঠে বসলো ঘুমন্ত

লোকগুলো। ডাকাত দল তাদের ঘিরে দাঁড়ালো। কয়েকজন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো নিচে।

কাফেলার লোকগুলো জেগে উঠলেও অস্ত্র হাতে নেয়ার সুযোগ পেলো না। নেমে পড়া ডাকাতরা অস্ত্র তাক করে চিৎকার দিয়ে বললো, 'তোমাদের জিনিসপত্র ও মেয়েদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। আর তোমাদের জীবন রক্ষা কর।'

ডাকাতরা মেয়েদেরকে একদিকে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'তোমরা সরে দাঁড়াও, নইলে মারা পড়বে!'

লোকগুলো ছিল নিরস্ত্র এবং সদ্য ঘুম জাগা। ফলে প্রতিরোধের কোন অবকাশ ছিল না তাদের। তবুও দু'জন লড়াই করার জন্য তলোয়ার বের করে রুখে দাঁড়াল। লড়াই দেখে বুঝা গেল, তারা খুবই দক্ষ যোদ্ধা। প্রাণপণে লড়ে চলল তারা ডাকাতদের সাথে।

আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গীরা টিলার ওপর থেকে বাজপাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। ডাকাতরা কিছু বুঝে উঠার আগেই একেকটি বর্শা একেকজন ডাকাতের শরীরের বিদ্ধ হয়ে গেল। অবশ্য এর আগেই কাফেলার দুঃসাহসী সেই দুই লড়াকু ডাকাতদের হাতে খুন হয়ে গেল।

এতে আলী বিন সুফিয়ানের কোন আফসোস ছিল না। তিনিও চাচ্ছিলেন, তাদের দু'একজন লোক মারা যাক। তাতে অন্যান্যদের মনে আতংক সৃষ্টি হবে। এ ছিল বিজলী চমকের মত যুদ্ধ, যে মুহূর্তে শুরু সে মুহূর্তেই শেষ। আতংকগ্রস্ত মেয়ে এবং লোকগুলো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল আলীর বাহিনীর দিকে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

আলী তার লোকদের ইশারা করলো সরে যেতে। কমাণ্ডোরা টিলার পাশে সরে গেল মুহূর্তে। আলী ভীতচকিত লোকগুলোর পাশে গিয়ে বসলেন।

মেয়েরা ভয়ে কাঁপছিল! তাদের সামনে নিজেদের দু'টি ও ডাকাতদের নয়টি লাশ পড়েছিল। আলী বিন সুফিয়ান তাদের সঙ্গে কথা শুরু করলেন।

তারা কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে বার বার ধন্যবাদ জানাতে লাগল। চোখ মুখ থেকেও ঠিকরে পড়তে লাগল কৃতজ্ঞতার আবেগ। বার বার বলতে লাগল, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন। আপনি আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন!'

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছো, কোথায় যাচ্ছো?'

তারা যে উত্তর দিল তা শুনে আলী বিন সুফিয়ান হেসে উঠলেন। বললেন, 'যদি তোমরাও আমাকে এমন প্রশ্ন করতে তবে আমিও এরকম মিথ্যা উত্তরই দিতাম। আমি সত্যি তোমাদের প্রশংসা করছি, এত আতংকের মধ্যেও তোমরা তোমাদের গোপনীয়তা বজায় রেখেছো।'

'আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?' তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'আর কোথায় যাচ্ছেন?'

'যেখান থেকে তোমরা এসেছো!' আলী বিন সুফিয়ান উত্তর দিল, 'আর সেখানেই যাচ্ছি, যেখানে তোমরা যাচ্ছো। আমাদের কাজ ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্যস্থল একই।'

লোকগুলো এবং মেয়েরা একে অন্যের দিকে প্রশ্নমাখা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। আবার অবাক হয়ে আলী বিন

সুফিয়ানকে দেখতে লাগলো। তিনি হাসছিলেন আর বলছিলেন, 'তোমরা কি দেখোনি আমি কেমন প্রফেশনাল? কি অবলীলায় ডাকাতদের শেষ করে দিলাম? কোন মুসাফির বা বণিক কি এমন কুশলী যোদ্ধা হতে পারে? যে উস্তাদী আমি দেখিয়েছি তা কি আনাড়ি লোকের পক্ষে সম্ভব?'

'না, তা সম্ভব নয়। আপনারা কি মুসলিম বাহিনীর লোক?'

'আমি খৃস্টান সেনাকমাণ্ডার।' আলী বিন সুফিয়ানের উত্তর।

'তাহলে নিশ্চয়ই আপনার সাথে ক্রুশ আছে?'

'তোমরা কি তোমাদের ক্রুশ দেখাতে পারবে আমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন আলী বিন সুফিয়ান। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি জানি তোমরা তা পারবে না। তোমাদের কাছে কোন ক্রুশ নেই, কেননা তোমরা যে কাজে যাচ্ছো তাতে সাথে ক্রুশ রাখা সম্ভব নয়। আমি তোমাদের নাম জানতে চাচ্ছি না। আমারও আর কোন পরিচয় তোমাদের কাছে দেবো না। শুধু এতটুকু বলবো, আমরা একই মঞ্জিলের মুসাফির! আর আমাদের মধ্যে কে কে বাড়ী ফিরে যেতে পারবে তাও বলতে পারি না।'

'আমরা অবশ্যই সফল হবো। খোদাওয়ান্দ ইসামসীহ যেভাবে আমাদের রক্ষা করার জন্য আপনাদের পাঠিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয়, আমরা সঠিক পথে আছি এবং আমরা অবশ্যই সফল হবো।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যু দুনিয়াতে ক্রুশের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মুসলমানদের এমন কোন্ শাসক আছে, যে আমাদের ফাঁদে পড়েনি এবং

পড়বে না? আমি তোমাদের এই উপদেশই দেবো, তোমরা আপন দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করবে।'

তিনি মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের কাজ সবচে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। খোদাওন্দ ইসামসীহ তোমাদের কোরবানীকে কখনও ভুলে যাবেন না। আমরা পুরুষ জাতি, আমরা মানুষের জীবন নেই এবং জীবন দেই। তোমাদের জীবন দিতে হয় না, কিন্তু যৌবন ও সম্ভ্রম কোরবানী দিতে হয়। এটাই বড় কোরবানী। কারণ, এর সাথে জড়িয়ে থাকে দুঃসহ গ্লানি, যা আমাদের কখনো স্পর্শ করে না।'

আলী বিন সুফিয়ানের কথার যাদু স্পর্শ করলো ওদের। তার বলার ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা ও যাদু ছিল যে, তাদের মনের সব সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল। তারা স্বীকার করলো, তারা খৃস্টান। নাশকতামূলক কাজের জন্য তারা দামেস্ক ও অন্যান্য মুসলিম রাজ্যে যাচ্ছে।

তারাও বণিকের বেশেই যাচ্ছিল। আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের অনেক গোপন বিষয় ও আইন কানুন জানতেন। জীবনে তিনি অসংখ্য খৃস্টান অপরাধীকে ধরে তাদের অপরাধ স্বীকার করিয়েছেন। তিনি যখন সে সব আচরণ করলেন, তখন মেয়ে এবং তাদের সঙ্গী খৃস্টান গোয়েন্দারা তাঁকে শুধু বিশ্বাসই করেনি বরং তাকে খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের কমাণ্ডার মনে করলো।

তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমার সঙ্গে একশো লোক রয়েছে। এরা সবাই লড়াকু গোয়েন্দা। এদের মধ্যে মুসলিম ফেদাইন সন্ত্রাসীও আছে। আমরা যাচ্ছি দামেস্ক ও অন্যান

শহরে বড় বড় অফিসারদের গুপ্তহত্যা করতে। বিশেষ করে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক নেতাদের।'

'আমাদের কাছে তাদের কিছু তালিকা আছে। দরকার মনে করলে আপনি তা নিতে পারেন।'

'না, তার কোন দরকার নেই আমার। এতদিন আমি মিশরে ছিলাম। সেখান থেকে বিশাল এক তালিকা সংগ্রহ করেই আমরা রওনা দিয়েছি।'

এভাবে গল্প করতে করতে আলী বিন সুফিয়ান তাদের সব গোপন তথ্য জেনে নিলেন। তারা জানালো, ডাকাতদের হাতে তাদের কমাণ্ডার নিহত হয়েছে। এই এলাকায় তারা এই প্রথম এসেছে। কমাণ্ডারের মৃত্যুতে তাদের অবস্থা এখন দিশেহারা অন্ধের মত। তাদের একজন নেতা ও পদপ্রদর্শক প্রয়োজন।

আলী বিন সুফিয়ান তাদের সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'দলের নেতৃত্ব দেয়ার মত অনেকেই আছে আমার সাথে। যদি প্রয়োজন মনে করো তবে তাদের মধ্য থেকে কাউকে দিয়ে দেবো তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য আগে জানা দরকার তোমাদের মিশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মিশনটা কি? তাহলে সেই অনুযায়ী একজন যোগ্য লোক তোমাদের দেয়া যেতে পারে। কারণ, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। বিশেষ কাজের জন্য দরকার বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। আরে ঘাবড়াও কেন? বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলে দলের দায়িত্ব অন্য কারো হাতে দিয়ে আমি নিজেই না হয় তোমাদের দায়িত্ব নেবো। আসল কথা হলো ক্রুশের সেবা। যেভাবে বেশী সেবা করা যায় সেটাই আমাদের করা উচিত।'

তারা তাদের মিশনের নাম বললো, 'বন্ধু'। কয়েকজন সেনাপতি ও আমীরের নাম উল্লেখ করে বললো, 'এসব সেনাপতিদের যে কোন উপায়ে আমাদের বন্ধু বানাতে হবে। এ জন্য এসব উপহার সামগ্রী ও মেয়েদেরকে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন মত এদের ব্যবহার করে এসব আমীর ও সেনাপতি, যারা এখনো খৃস্টানদের শত্রু আছে তাদের বন্ধু বানানোই এ মিশনের কাজ।'

'তোমাদের ও আমাদের উদ্দেশ্য এক, কিন্তু কাজ ভিন্ন। আমাদের তালিকায়ও এসব আমীর ও সেনাপতিদের নাম আছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এদের খুন করা। এ ক্ষেত্রে কাজ হাসিল করাই বড় কথা, কিভাবে তা হাসিল হলো তা বড় নয়। তোমরা যদি ওদেরকে আমাদের পক্ষে আনতে পারো সে হবে অতি উত্তম। আমাদের অনেক কাজ তখন তারাই করে দেবে। আর যদি তা না পারো তাহলে তাদের ভাগ্যে লেখা থাকবে মরণ। সে ব্যবস্থা আমিই করবো। তার মানে আমাদের উভয়ের কাজ এখন অভিন্ন। তা, তোমরা দামেস্কে কোথায় উঠবে?'

তাদের একজন উত্তর দিল, 'দামেস্কে গিয়েই এসব মেয়েরা পোষাকে আশাকে মুসলমান হয়ে যাবে। প্রথমে আমরা আবাসিক হোটেলে গিয়ে উঠবো। সেখান থেকে বণিকের বেশে যোগাযোগ করবো আমীর ও সালারদের সাথে।'

০

একটু পর সূর্য উঠল। আলী বিন সুফিয়ানের কাফেলা নাশতা সেরে দামেস্কের দিকে যাত্রা করলো। খৃস্টান যুবতী ও

লোকগুলোও শামিল হয়ে গেল তাদের কাফেলায়। সঙ্গে নিল ডাকাতদের বাড়তি ঘোড়াগুলোও।

খৃস্টানরা আলী বিন সুফিয়ানকে নেতা মেনে এগিয়ে চললো তাদের সাথে। তিনি ওদের বললেন, 'কাফেলার অন্য যাত্রীদের সাথে এ নিয়ে কোন কথা বলো না। কারণ এ কাফেলায় মুসলিম গুপ্তঘাতক ফেদাইনরাও রয়েছে। তারা আমাদের হয়ে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু সব কথা তাদের বলতে নেই. কোন মুসলমানকেই পুরোপুরি বিশ্বাস ও ভরসা করতে নেই।'

আলীর কথা তাদের খুব মনপূত হলো। অধিকাংশ সময়ই তারা আলীর কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করলো। আলী বিন সুফিয়ানও এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগালেন। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করে করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন।

পরের দিন। দামেস্কে পৌঁছে গেল কাফেলা। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশ মত হোটেলে যাওয়ার পরিবর্তে কাফেলা এক ময়দানে ক্যাম্প করলো। বাইরে থেকে কোন বণিকের কাফেলা এলে লোকেরা সস্তায় মালামাল. কেনার আশায় সহজেই ভীড় জমায় সেখানে। ওদের ওখানেও রীতিমত লোকের ভীড় জমে গেল।

আলী বিন সুফিয়ান দশটি ঘোড়া বিক্রির ঘোষণা দিলেন। সেই ক্রেতার ভীড়ে দামেস্কের অনেক ব্যবসায়ী ও দোকানদারও ছিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেখানে মেলা বসে গেল। আলী বিন সুফিয়ান তার লোকদের বলে দিল, তারা যেন মাল ধরে রাখে। তাড়াতাড়ি বিক্রি না করে ফেলে।

কয়েকজন কমাণ্ডোকে ডেকে নিয়ে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের

কথা বললো তাদের। বললো, 'তোমরা সব সময় ওদের উপর নজর রাখবে। ওরা যেন ভীড়ের মাঝে একেবারে মিশে না যায় এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা কাউকে বলে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।'

এসব কমাণ্ডোরা ছিল খুবই দক্ষ। তারা পোশাক পাল্টে ভীড়ের মাঝে মিশে গেল এবং খৃস্টানদের দিকে কড়া নজর রাখতে লাগলো।

আলী বিন সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা মাগরিবের নামাজের সময় কায়দা করে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে নামাজ আদায় করে এলো। খৃস্টান যুবতী ও লোকগুলো এবং তাদের ওপর যারা নজর রাখছিল তারা রয়ে গেলো তাবুতেই।

মসজিদে মুসল্লীদের সাথে কথা প্রসঙ্গে তারা জনগণের চিন্তাধারা জেনে নিলো। জনগণের মনের আবেগ ছিল বড় আশাব্যঞ্জক। তাদের মধ্যে কিছু লোক নতুন খলিফা ও ওমরাদের কঠোর সমালোচনা করলো। তাদের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, মুসলিম বিশ্ব এখন খৃস্টানদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং খেলাফত বিলাসপ্রিয় আমীরদের হাতে চলে গেছে, এ সত্যও তারা বুঝতে পেরেছে। তাঁরা যে খুবই মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় আছে তাও প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের কথায়। অনেকে এমনও বললো, 'নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর এখন শুধু সালাহউদ্দিন আইয়ুবীই আছেন, যিনি এ সয়লাবের মোকাবেলা করতে পারেন, পারেন ইসলামের মর্যাদা ও গৌরব টিকিয়ে রাখতে।'

আলী তার বাহিনীর সবাইকে বলে দিয়েছিলেন, 'এই মেয়ে

ও খৃস্টানদের কাছে নিজেদের পরিচয় কখনো প্রকাশ করবে না। তোমরা যে মুসলমান, তাও ওদের জানানো চলবে না। তাদেরকে বলবে, আমরা সকলেই খৃস্টান, এক বিশেষ মিশনে এখানে এসেছি। তাদের মনে যেন কোন সন্দেহ না জাগে সে দিকে খেয়াল রাখবে।'

মসজিদ থেকে ফিরে আলী বিন সুফিয়ান সবাইকে বললেন, 'আজ রাতে সবাই আরাম করো। এরপর কি করতে হবে আগামীকাল বলে দেবো।'

সবাইকে এ কথা বলে আলী চুপিসারে বেরিয়ে এলেন তাবু থেকে। সবার অলক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছলেন সেনাপতি তাওফিক জাওয়াদের বাড়ি। তার পরণে বণিকের বেশ, মুখে কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ। দারোয়ানকে বললেন, 'ভেতরে সংবাদ দাও, কায়রো থেকে আপনার এক বন্ধু এসেছেন।'

দারোয়ান ভেতরে সংবাদ দিতেই আলী বিন সুফিয়ানকে মেহমানখানায় ডেকে নেয়া হলো। কিন্তু তাওফীক জাওয়াদ তাঁকে চিনতে পারলেন না। আগন্তুকের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'চিনতে না পারারই কথা। এমন বুড়োকে কে আর মনে রাখে!'

গলার স্বর শুনেই তাওফিক জাওয়াদ চিনে ফেললেন তাকে। দ্রুত এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে পরিহাসতরল কণ্ঠে বললেন, 'এ যে দেখছি অর্ধেক বুড়ো! চুল দাড়ি পাকলেও গলার স্বর মোটেও পাকেনি!' এ কথায় দু'জনেই হেসে উঠলেন।

এ লোকটির ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল আলী বিন সুফিয়ানের। তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। বললেন, 'আগে আমার জানা দরকার এখানকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা। কায়রোতে এরই মধ্যে অনেক দুঃসংবাদ গিয়ে পৌঁছেছে।'

তাওফিক জাওয়াদ সমস্ত সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে বললেন, 'আলী ভাই, তুমি একে গৃহযুদ্ধ বলবে। কিন্তু খৃস্টান ভীতি রোধ করতে হলে আইয়ুবীকে বর্তমান খেলাফতের বিরুদ্ধে অবশ্যই সামরিক অভিযান চালাতে হবে।'

'যদি আমরা কায়রো থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে এখানে পৌঁছি, এখানকার সৈন্যবাহিনী আমাদের বাঁধা দেবে না?' আলী বিন সুফিয়ান প্রশ্ন করেন।

'তোমরা আক্রমণের গতিতে আসবে না।' তাওফীক জাওয়াদ বললেন, 'সুলতান আইয়ুবী আসবেন খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করতে। খলিফার সম্মানে কিছু সৈন্য সঙ্গে আনবেন তিনি। যদি খলিফার নিয়ত ভাল হয়, তবে তাঁকে স্বাগত জানাবেন। খলিফার সামনে আইয়ুবী উপস্থিত থাকলে অন্য কোন আমীরই মাথা তুলতে সাহস পাবে না। যদি খলিফা আইয়ুবীকে বাঁধা দান করতে চান, তবে আমি নিশ্চিত, তিনি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবেন। এ অবস্থায় এখানকার কোন সৈন্য আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি হবে না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।'

'এতটা জোর দিয়ে বলা কি ঠিক হচ্ছে?'

'অবশ্যই। আমি তো বলতে চাই, এখানকার সৈনিকরা তোমাদের সহযোগিতাও করবে। কিন্তু এটা এখনকার

পরিস্থিতি। দিন যত যাবে ততই পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। মনে রেখো, তোমরা যত দেরী করবে এখানকার সৈন্যরা ততই তোমাদের থেকে দূরে সরে যাবে। কারণ, সৈনিকদের মাঝে যে ইসলামী প্রেরণা ও জোশ আছে তা শেষ করার চেষ্টা চলছে। তুমি তো জানো আলী ভাই! শাসকশ্রেণী যদি আরাম আয়েশ ও বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে যায়, তখন তারা প্রথমে শত্রুর সাথে আপোষরফা করে, যাতে স্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘাতের আশংকা দূর হয়। তারপর তাঁরা সৈন্য বিভাগকে দুর্বল করতে থাকে। তখন তারা এমন সেনাপতি খোঁজে, আল্লাহর বিধানের চাইতে যাদের কাছে সুলতানের ইচ্ছা অধিক গুরুত্ব পায়। আর স্বার্থের গোলাম পাওয়া এ পৃথিবীতে কোন কঠিন কাজ নয়।

আল্লাহর গোলামীর চাইতে নিজের খাহেশ যাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পায়, সে সুলতান হোক আর সেনাপতি, তাঁরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মত মর্দে মুজাহিদকে পছন্দ করবে না। এখানে এখন এই মানসিকতারই চাষ শুরু হয়েছে। আমাদের কয়েকজন সম্মানিত সামরিক অফিসার তাঁদের ঈমানী জযবা ও প্রেরণার জন্য বরখাস্ত হয়েছেন। আমার মত সেনাপতি, যারা খৃস্টানদের কখনও বন্ধু বলবে না, যারা মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নূরুদ্দিন জঙ্গীর জ্বালিয়ে দেয়া জিহাদী আগুন বুকে ধরে রাখবে, বেশী দিন তারা এখানে টিকতে পারবে না।'

'তবে কি আমি সুলতান আইয়ুবীকে গিয়ে বলবো, এখানকার সৈন্যরা আপনার সহযোগিতা করবে?' আলী বিন সুফিয়ান প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই বলবে।' তাওফিক জাওয়াদ উত্তর দিলেন, 'কিন্তু

খলিফার গার্ড রেজিমেন্ট ও আমীরদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রক্ষীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পারে। এই গ্রুপেও সৈন্য সংখ্যা কম নয়। জঙ্গীর ইন্তেকালের পর এই বাহিনীকে গৃহযুদ্ধের মোকাবেলা করার জন্য নানাভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'এখানে জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ আশাব্যঞ্জক। আমরা এখানে এলে জনগণ আমাদের পক্ষে থাকবে বলেই আমার ধারনা।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'জাতি এত তাড়াতাড়ি অনুভূতিহীন হতে পারে না।' তাওফীক জাওয়াদ বললো, 'যে জাতি তার জোয়ান সন্তানকে শহীদ হতে দেখেছে, তারা শত্রুকে কখনও ক্ষমা করবে না। আর যে সৈন্যরা শত্রুর সাথে শক্তি পরীক্ষা করেছে তাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও করা যাবে না।'

'কিন্তু প্রশাসনের কাছে এমন লোভনীয় বস্তু আছে, যা জাতি ও সেনাবাহিনীকে নিষ্প্রাণ এবং অনুভূতিহীন করে দিতে পারে।' বললেন আলী।

'ঠিকই বলেছেন আপনি। প্রশাসন এখন সেই লোভনীয় বস্তুই ব্যবহার করছে। প্রশাসন এখন জাতি ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে। জাতির কাছে সামরিক বাহিনীকে খাটো করা হচ্ছে।'

'আমি মুহতারাম নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাই।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন। 'তিনি খলিফার মাতাও। তিনি সুলতান আইয়ুবীকে দূত মারফত চিঠি পাঠিয়েছিলেন এই কথা লিখে যে, তিনি যেন ইসলামের সম্মান রক্ষা করেন। তাঁকে এখানে ডাকা কি সম্ভব?'

'গতকালই তার সঙ্গে কথা হয়েছে।' তাওফীক জাওয়াদ বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এখানে ডেকে আনতে পারি, তোমার নাম শুনলে জলদি চলে আসবেন।'

তাওফীক জাওয়াদ তার চাকরানীকে ডেকে বললেন, 'এখনি খলিফার মাতার কাছে যাও, তাঁকে আমাদের সালাম দিয়ে চুপি চুপি বলবে, কায়রো থেকে মেহমান এসেছেন। ওনার জন্য তিনি আমার এখানে অপেক্ষা করছেন।'

০

যখন আলী বিন সুফিয়ান তাওফীক জাওয়াদের সাথে আলাপ করছিলেন, তখনো তার তাবুতে আলো জ্বলছিল। অনেক রাত। খরিদ্দারের ভীড় কমতেই অনেক দেরী হয়েছিল। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গীরা দীর্ঘ সফর শেষে ছিল ক্লান্ত। তারা বাজার থেকে দুম্বা ও বকরী কিনে এনে সেগুলো ভুনা করে খাচ্ছিল।

মেয়েরা ছিল আলাদা তাবুতে। খৃস্টান পাঁচ গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গীদের সাথেই একত্রে খানা খাচ্ছিল। তারা তাদের শরাবের পাত্র বের করলো যাতে আহারের মজলিশ আলোকিত হয়ে উঠে। তারা যখন শরাবের পিয়ালা সবার সামনে রাখলো, সবাই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। তাতে খৃস্টানরা খুবই অবাক হলো। আলী বিন সুফিয়ান তাদের বলেছিলেন, তাঁর সাথীদের মধ্যে মুসলমানও আছে, খৃস্টানও আছে। যারা মুসলমান তারা আবার ফেদাইন গ্রুপের গুপ্তঘাতক। ফেদাইন মানে, হাসান বিন সাব্বাহর দলের লোক, এরাতো শরাবকে হারাম জানে না।

খৃস্টানদের মনে প্রবল সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলো, কারণ তারাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা দু'চারটি এমন নমুনা দেখতে পেলো, যার দরুণ তাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। তারা একে একে সেখান থেকে এমনভাবে উঠে যেতে লাগলো, যেন তাদের তাবুতে শুতে যাচ্ছে।

তারা মেয়েদের তাবুতে ঢুকে তাদের সন্দেহের কথা বললো। বললো, 'এদের আসল পরিচয় বের করতে হবে। এরা কেউ খৃস্টান নয়। কিন্তু কারা এরা?'

মেয়েরা তাদের শান্তনা দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, এ দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। পুরুষের পেট থেকে কথা বের করার যে ট্রেনিং এতদিন পেয়েছি, দেখি তা কতটুকু কাজ দেয়। কৌশলে কথা আদায় করা কোন ব্যাপারই না। একটু অপেক্ষা করো, কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে, এরা আসলে কারা?'

খৃস্টান গোয়েন্দারা চলে গেল নিজ নিজ তাবুতে। এক মেয়ে বেরিয়ে এলো তাবু থেকে। সে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কমাণ্ডোদের কেউ কেউ তাকে দেখেই অন্য দিকে সরে গেল। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে মেয়েটি এমন জায়গায় গিয়ে বসলো, যে জায়গাটা নির্জন কিন্তু তাবু থেকে কেউ বাইরে এলে ঠিকই তাকে দেখতে পায়।

অনেক রাত পর্যন্ত মেয়েটি একাকী সেখানে বসে রইল। গভীর রাত। আলী বিন সুফিয়ানের এক পাহারাদার তার কাছে গিয়ে বললো, 'এত রাতে আপনার একাকী বাইরে থাকা ঠিক না। তাবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

মেয়েটি উঠে আড়মোড় ভেঙে বললো. কছুতেই ঘুম আসছে না। তাবুতে থাকতে থাকতে মনটা অস্থির হয়ে গেছে। বার বার কেবল তার কথাই মনে পড়ছে। আপনার অসুবিধা হলে আমি দূরে গিয়ে বসি।'

'না, না, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।'

'না, দূরে গিয়ে বসাই ভালো, নইলে আবার কার না কার নজরে পড়ে যাই।' মেয়েটি এই বলে হেঁটে তাবু থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

পুরুষ মানুষকে আঙ্গুলের ওপর নাচাতে পারে এমন ট্রেনিং দিয়েই পাঠানো হয়েছিল তাদের। মেয়েটি একাকী হেঁটে দূরে চলে যাচ্ছে দেখে পাহারাদার প্রথমে একটু ইতস্তত করলো, তারপর তার কোন বিপদ হতে পারে ভেবে তার পিছু নিল। হাঁটতে হাঁটতে তাবু থেকে বেশ দূরে চলে এলো তারা। মেয়েটি পিছন ফিরে পাহারাদারকে বললো, 'আপনি আবার কোথায় যাচ্ছেন?'

'না, মানে, আপনার কোন বিপদ হয় কিনা ভেবে আপনার পিছু নিয়েছি।'

'বিপদের কথা বলছো! বিপদ তো আমাদের তাবুর ভেতর! আমাদের সঙ্গী পুরুষগুলো এক একটা বদের হাড্ডি। ওদের খাই খাই আর মেটে না। ওদের জ্বালা সইতে না পেরেই তো তাবু থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

'এ কথা আগে বলোনি কেন? চলো, এখন থেকে আমরা দৃষ্টি রাখবো যেন ওরা তোমাদের আর জ্বালাতন করতে না পারে।'

মেয়েটি তার সাথে ফিরে চললো। হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'আজ বুঝি রাত জাগার ডিউটি পড়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ।' বললো পাহারাদার।

'এক কাজ করো, আমার তাবুতে চলে এসো তুমি। তাহলে ঐ শয়তানরাও আসার সাহস পাবে না, আবার তোমারও ঘুমিয়ে পড়ার ভয় থাকবে না। গল্প করে বেশ সময় কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

পাহারাদার এ কথার কোন জবাব দিল না।

চুপচাপ আরো কিছু পথ এগিয়ে এলো ওরা। মেয়েটি পাহারাদারের একদম পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে বললো, 'কি ব্যাপার, আমার কথায় মন খারাপ করলে? জবাব দিলে না যে!'

মেয়েটি এমন অভিনয় শুরু করলো, লোকটি শেষ পর্যন্ত তার অভিনয়ে গলে গেল। তাবুর কাছে এসে মেয়েটি আবার বললো, 'এসো, ভেতরে এসো।'

মেয়েটির পীড়াপীড়িতে অনেকটা ভদ্রতার খাতিরে সে মেয়েটির তাবুতে প্রবেশ করলো।

তাবুতে ছোট একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সেই আলোতে ওরা পরস্পরকে ভাল করে দেখলো। মেয়েটি আবেগমাখা কণ্ঠে আকর্ষণীয় হাসি হেসে বললো, 'বাহ! তুমি তো বেশ সুপুরুষ হে! আমাকে তুমি শয়তানদের হাত থেকে আগলে রাখতে পারবে বলেই মনে হয়। কি বলো, পারবে না?'

মেয়েটির অনিন্দ্য রূপের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো পাহারাদার। মেয়েটি শরাবের ছোট একটি পাত্র উঠিয়ে বললো, 'সামান্য একটু পান করবে?'

'না!'

'কেন?'

'আমি মুসলমান!'

'যদি এত জোরের মুসলমান হও তবে খৃস্টানদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছো কেন?'

লোকটি চমকে উঠলো। সতর্ক হয়ে বললো, 'তার মূল্য আমরা পেয়ে থাকি।'

মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি চতুর। তার মদির কটাক্ষ আর চটুল বাক্যবাণে লোকটি ক্রমেই বশিভূত হতে লাগলো। মেয়েটি তাকে বললো, 'আচ্ছা, শরাব পান না করো, শরবত তো পান করবে?'

সে পাশের তাবু থেকে এক গ্লাস শরবত নিয়ে এলো। লোকটি গ্লাস হাতে নিয়ে মুখে লাগালো, কিন্তু চুমুক না দিয়েই গ্লাসটি আবার নিচে নামিয়ে হেসে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'এতে কি পরিমাণ হাশিশ মিশিয়েছো?'

মেয়েটিও চমকে উঠলো এবার। তবে কি ও বুঝে ফেলেছে তার চালাকি? দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সংযত কণ্ঠে বললো, 'বেশি না, সামান্যই।' তারপর একটু বিরতি দিয়ে তার দিকে কটাক্ষ হেনে চটুল কণ্ঠে বললো, 'যতটুকু দিলে তুমি কিছুক্ষণ আত্মহারা হয়ে থাকবে।'

'কেন?'

'কারণ আমি তোমাকে পেতে চাই। তুমি কি বুঝো না কতটা উতলা হলে কোন যুবতী তাবু ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে?'

'তবে যে বললে তোমার সঙ্গীরা তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'ও কথা না বললে তুমি কি আসতে আমার তাবুতে? প্লিজ, হয় আমাকে গ্রহণ করো, নইলে তোমার খঞ্জর আমার বুকে আমূল বসিয়ে দাও।' মেয়েটি আবেগভরা কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'আমি দিনের বেলাতেই তোমাকে দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, কি করে তোমাকে পাওয়া যায়। রাতে তোমার ডিউটি পড়ায় আমার মনে হলো, আল্লাহ আমার গোপন ইচ্ছা সফল করার জন্যই এ ব্যবস্থা করেছে। আমি তোমাকে ডিউটিতে দেখেই তাবু থেকে বের হয়ে তোমার চোখের সামনে দিয়ে ঘোরাফিরা করতে লাগলাম। তুমি যখন আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলে তখন গভীর দৃষ্টিতে আমি দেখছিলাম তোমাকে। মনে হচ্ছিল, যুগ যুগ ধরে আমরা পরিচিত। আমরা দু'জন বহু কাল ধরে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে বেঁচে আছি। তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি প্রাণ। তুমি তো দেখেছো, আমি তোমাকে শরাব সাধলেও নিজের জন্য নেইনি। কারণ শরাব আমি পান করি না, আমি যে মুসলমান!'

পাহারাদার অবাক হয়ে বললো, 'তুমি এই কাফেরদের খপ্পরে কেমন করে পড়লে?'

'বারো বছর ধরে আমি এদের সাথে আছি।' মেয়েটি উত্তর দিল। 'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা! সে সময় আমার বয়স বারো বছর। বাবা আমাকে এদের কাছে বেঁচে দিলেন। আমার জানা ছিল না আমার ক্রেতা খৃস্টান। তারাই আমাকে এ পথে নামিয়েছে। কোন উপায় নেই বলেই আমি এদের সাথে

এখানে এসেছি।

দামেস্ক ও বাগদাদ আমার স্বপ্নের শহর। জীবনে বহু বার নাম শুনেছি এসব শহরের, শুনেছি এর শানশওকতের কথা। মুসলিম রাজত্বের প্রাণকেন্দ্র এ শহর! কত আশা ছিল তা দেখার! এখানে আসার পর মনে হচ্ছে আমি আবার আমার ভাই-বোন আত্মীয়দের মাঝে ফিরে এসেছি। এ মাটিতে পা দিতেই এর আকাশ, বাতাস, মাটি আমার মনে জাগিয়ে দিল ধর্মের সেই পূণ্য স্মৃতি, আমি এক মুসলমান। মুসলমান হয়ে মুসলমানের ধ্বংসের জন্য আমি কি করে কাজ করি বলতো!'

আবেগে কেঁদে ফেললো মেয়েটি। গাঢ় স্বরে বললো, 'আমার মন কাঁদছে! প্রাণ কাঁদছে!'

হঠাৎ সে যুবকের হাত চেপে ধরে বললো, 'তুমি না মুসলমান! এ কাজ করতে তোমার বিবেকে বাঁধে না?' তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললো, 'চলো আমরা দু'জন পালিয়ে যাই। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাও, আমি সেখানেই যাবো। যদি মরুভূমিতেও নিয়ে বেড়াও, আমি খুশি মনেই তোমার সাথে থাকবো। নিজের জাতিকে এভাবে ধোকা দেয়ার পাপ থেকে তুমিও বাঁচো, আমাকেও বাঁচাও। আমার কাছে সোনার অনেক মোহর আছে, সে মোহর ভেঙে খেলেও আমাদের চলে যাবে বহুদিন।'

আলী বিন সুফিয়ানের এই কমাণ্ডো খুবই হুশিয়ার ছিল। সে হুশিয়ার ছিল বলেই হাশিশ মেশানো শরবত পান করেনি, হাশিশের গন্ধ সে ভালমতই চিনতে পেরেছিল। কিন্তু তারপরও সে মেয়েটির ছলাকলার প্রভাব এড়াতে পারলো না।

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা এখানে কি করতে এসেছো?'

এ প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি যখন কথা বলা শুরু করলো, তখন দেখা গেলো আলীর লোকটির চেহারা বার বার পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির কথার বিষ মেশানো যাদু ততক্ষণে ঘায়েল করে ফেলেছে যুবককে। কিন্তু অনড় বিশ্বাস ও প্রবল দায়িত্ববোধ থাকায় সে বললো, 'আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, তোমরা এখানে মুসলানদেরকে ধোকা দিতে পারবে না। আর যদি তুমি মনেপ্রাণে সততা নিয়ে এই অপকর্ম থেকে বিরত হও, তবে তুমি সৌভাগ্যবতী। আমি কথা দিচ্ছি, সত্য ও সুন্দরের পথে ফিরে এলে তুমি আমার সাথেই থাকবে।'

মেয়েটি আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে তাকে জড়িয়ে ধরলো। লোকটি বললো, 'আমি আমার কমাণ্ডারকে বলবো, তোমাকে যেন অন্য মেয়েদের থেকে পৃথক রাখেন আর কোন আমীরের হাতে তুলে না দেন।'

মেয়েটি আনন্দে অধীর হয়ে তার হাতে চুমো খেলো। এ আনন্দ যেমন তার অভিনয় ছিল, তেমনি আলী বিন সুফিয়ানের এত সতর্ক গোয়েন্দাকে এমন চমৎকারভাবে ধোকা দিতে পারার সাফল্যের জন্যও তার আনন্দ হচ্ছিল।

'একটু থামো!' মেয়েটি তাকে বললো, 'আমি দেখে আসি আমার সঙ্গীরা শুয়ে পড়লো কিনা!'

সে তাবু থেকে বের হয়ে গেল।

০

আলী বিন সুফিয়ান সেনাপতি তাওফীক জাওয়াদের কামরায় বসে নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ইসলামের মহান মুজাহিদের বিধবা স্ত্রী দূত মারফত তার মনের কথা সমস্তই সুলতান আইয়ুবীর কাছে লিখে জানিয়েছিলেন। তবুও তাঁর সঙ্গে দেখা করে চিঠিতে লেখা যায়না এমন কোন উপদেশ ও তথ্য থাকলে তা জেনে নেয়া প্রয়োজন।

একটু পরই সেই সম্মানিতা মহিলা সেখানে এলেন। কিন্তু ছদ্মবেশের কারণে আলী বিন সুফিয়ানকে চিনতে পারলেন না। তাওফীক জাওয়াদ পরিচয় করিয়ে দিতেই অশ্রুতে দু'চোখে ভাসিয়ে তিনি বললেন, 'হায়! এও আমার ভাগ্যে লিখা ছিল, আপন লোকেরা আজ গোপনে ও ছদ্মবেশে দেখা করতে আসে! তুমি তো এখানে আসতে বীরের বেশে, মাথা উঁচু করে। অথচ আজ এমন অবস্থায় এলে, কেউ যেন তোমাকে চিনতে না পারে! আর আমাকেও ঘর থেকে এমন সাবধানে বের হতে হলো, কেউ যেন দেখে না ফেলে, আমি কোথায় যাচ্ছি।'

আলী বিন সুফিয়ানের চোখও অশ্রুতে ভারী হয়ে এলো। আবেগের আতিশয্যে অনেকক্ষণ তিনি কোন কথাই বলতে পারেননি। জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর বৈধব্য বেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

বেগম জঙ্গী বললেন, 'আলী! আমি এই বেশ ধারণ করেছি শুধু স্বামীর শোকে নয়, আমি শোকাহত আজ জাতির দুর্যোগে, দুর্ভোগে। স্বার্থপর ছোট ছোট আমীররা আমার সন্তানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জাতির সম্মান ও ইজ্জত খৃস্টানদের পদতলে সোপর্দ করে দিয়েছে। তোমরা এখনো জানো না, এরই মধ্যে আমরা কি হারিয়েছি, কতটা দেউলিয়া হয়েছি!

জঙ্গী যে সমস্ত খৃস্টান কয়েদী ও যুদ্ধবন্দীকে কারারুদ্ধ করেছিল তারা এখন কোথায় তুমি জানো? সম্রাট রিজনেল্ট,

যাকে মাত্র কয়েক মাস আগে জঙ্গী তার দলবলসহ বন্দী করেছিল এবং ক্রাক থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল, সে এখন আর বন্দী নেই। জঙ্গী সম্রাট রিজনেল্টকে বন্দী করতে পেরে খুবই খুশী ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি খৃস্টানদের সাথে এমন দরকষাকষি করে এ সকল বন্দী বিনিময় করবো, যাতে খৃস্টানদের কোমর ভেঙ্গে যায়।'

জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী বললেন, 'একজন সম্রাট ও যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি গ্রেফতার হওয়া কোন সাধারণ ঘটনা নয়। আমরা তাঁর বিনিময়ে খৃস্টানদের কাছ থেকে অনেক চড়া শর্ত আদায় করে নিতে পারতাম। কিন্তু গতকাল আমার ছেলে আমার কাছে এসে বললো, 'মা! আমি খৃস্টান সম্রাট ও তার সঙ্গীদের সকলকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিয়েছি।'

এ খবর শুনে আমি মনে এমন প্রচণ্ড আঘাত পেলাম যে, অনেকক্ষণ আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। শেষে যখন হুশ হলো ছেলেকে শুধু বললাম, 'এই যুদ্ধ বন্দীদের বিনিময়ে তুমি কি তোমার সকল যুদ্ধ বন্দী মুক্ত করে নিয়েছো?'

ছেলে কচি খোকার মত উত্তর দিল, 'আমি আমার যুদ্ধ বন্দী নিয়ে কি করবো? আমি তো আর কোনদিন কারো সাথে যুদ্ধ করবোনা। আর এদের শুধু শুধু খাইয়ে খরচ বাড়িয়ে কি লাভ?'

আমি ছেলেকে বললাম, 'দেখো, তুমি আর কোনদিন তোমার বাবার কবর জিয়ারত করতে যাবে না। তুমি যখন মরবে তখন তোমার লাশ ঐ কবরের পাশে দাফন হবে না, যেখানে তোমার বাবা শুয়ে আছেন। এই কবরস্থানে এমন সব শহীদগণ শুয়ে আছেন, যারা খৃস্টানদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তোমাকে সেখানে দাফন করা হলে তাঁদের আত্মা কষ্ট পাবে ও তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।' কিন্তু আমার ছেলে তো শিশু, সে

কিছুই বোঝে না। আমি সেই আমীরদের সাথেও মিশেছি, আমার ছেলে যাদের হাতের পুতুল। তারা আমাকে সম্মান দেখায় কিন্তু আমার কথার কোন মূল্য দেয় না।

খৃস্টানরা তাদের সম্রাট ও যুদ্ধ বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে মুসলমানদের মুখের ওপর চপেটাঘাত করেছে। কিন্তু আমি ভেবে কুল পাইনা, সালাহউদ্দিন কায়রোতে বসে কি করছেন? তিনি আসছেন না কেন? আলী বিন সুফিয়ান! বলো, সুলতান আইয়ুবী কি চিন্তা-ভাবনা করছেন? তাঁকে গিয়ে বলবে আপনার এক বোন আপনার জাতির অসম্মান দেখে শোক প্রকাশ করছে। তাঁকে আরও বলবে, আপনার বোন শোকের কালো পোশাক সেই দিন ফেলবে, যেদিন আপনি দামেস্কে উপস্থিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের সম্মান বিলাস প্রিয় ও ঈমান বিক্রেতা আমীরদের থেকে ছিনিয়ে নিবেন ও তাঁকে উদ্ধার করবেন! নতুবা তিনি এ পোষাকেই মৃত্যুবরণ করবেন আর অসিয়ত করে যাবেন, তাঁকে যেন এ পোষাকেই দাফন করা হয়। কোন কাফন যেন তাকে পরানো না হয়। এ অবস্থায় আমি কিয়ামতের দিন আমার স্বামী ও আল্লাহর সামনে সাদা কাফনে যেতে চাই না।'

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর চোখ থেকে তখনো অশ্রু ঝরছিল। আলী বিন সুফিয়ান তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মোহতারেমা, আমি এ আবেগের মূল্য খুব ভাল করেই বুঝি! দয়া করে আমার কথাগুলো একটু শুনুন। সুলতান আইয়ুবীও আপনার মত অধীর ও অশান্তভাবেই প্রহর কাটাচ্ছেন। আপনি জানেন, যুদ্ধ কেবল আবেগ ও উত্তেজনার বশে হয় না। এখানকার সঠিক অবস্থা না জেনে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়া প্রকৃত মুজাহিদের কর্ম নয়। এমন কাজ আইয়ুবী করতে

পারেন না।

আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। আইয়ুবী অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে দেশে গৃহযুদ্ধ না বাঁধে। গৃহযুদ্ধ বাঁধলে তাতে মিল্লাতে ইসলামিয়ারই ক্ষতি হবে। আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, ইসলামের স্বার্থে আমরা এগিয়ে এলে জাতি আমাদের সাথেই থাকবে। সৈন্যদের ব্যাপারেও তাওফীক জাওয়াদ আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছেন, এখানকার সৈন্যরা আমাদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াবে না। তবে রক্ষীবাহিনী মোকাবেলায় নামতে পারে।'

'আমিও আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি, জাতি আপনাদের সাথেই থাকবে।' জঙ্গীর স্ত্রী বললেন, 'আমি নারী, যুদ্ধের ময়দানে হয়তো যেতে পারবো না। কিন্তু আমার লড়াই অব্যাহত আছে। আমি আমার সেক্টরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। আমি নারী সমাজের মাঝে জাতীয় চেতনাবোধ এমন তীব্রভাবে সৃষ্টি করে রেখেছি যে, তাদের স্বামী, সন্তান ও ভাইবেরাদর যদি আপনাদের সহযোগিতায় এগিয়ে না যায়, তবে তারা নিজেদের ঘরে কিছুতেই শান্তিতে বসে থাকতে পারবে না।

যদি দরকার হয়, সামর্থবান নারীরা যাতে ময়দানে আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতে পারে তারও প্রস্তুতি চলছে। আমার তত্ত্বাবধানে যেসব মেয়েরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা এরই মধ্যে তলোয়ার চালনা, তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি কাজে নৈপুণ্য অর্জন করেছে। দামেস্কের ঘরে ঘরে এখনো সেইসব মহিলারই আধিপত্য, যারা ঈমানদার, বিশ্বস্ত ও অনুগত। যদি গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে দামেস্কের প্রতিটি ঘরে মেয়েরা এই অর্বাচীন খলিফার বিরুদ্ধে সামরিক দূর্গ গড়ে তুলবে।

এখনো যদি সুলতান আইয়ুবী সৈন্য নিয়ে এখানে চলে আসে, তবে আমার নাবালেগ সন্তান ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা নিজেদেরকে অসহায় ও নি:সঙ্গ দেখতে পাবে।'

আবেগদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তুমি জলদি চলে যাও আলী ভাই! দ্রুত ফিরে এসো সৈন্য নিয়ে। এখানকার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। জাতি তোমাদের পথ আগলে দাঁড়াবে না। যদি বর্তমান খলিফার খুন তোমাদের প্রয়োজন হয়, হত্যা করো তাকে। সে নূরুদ্দিন জঙ্গী ও আমার সন্তান বলে দয়া দেখাতে গিয়ে জাতির সর্বনাশ করো না। আমার ছেলের দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাক কিন্তু মুসলিম মিল্লাতকে আমি খণ্ড খণ্ড হতে দিতে পারি না।'

খলিফার মায়ের কণ্ঠ থেকে এ ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার পর তাওফীক জাওয়াদ ও আলী বিন সুফিয়ানের আর কিছুই বলার ছিল না। তারা যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে বসলো। সিদ্ধান্ত হলো, সুলতান আইয়ুবী অতি গোপনে আসবেন, খলিফা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা যেন জানতে না পারে।

০

আলী বিন সুফিয়ানের কমাণ্ডের কাছ থেকে গোপন তথ্য জেনে নিয়ে খৃস্টান মেয়েটা তাকে বসিয়ে রেখে তার সাথীদের কাছে গেলো। বললো, 'আমরা ধোকা খেয়েছি। এরা সবাই মিশরের লড়াকু গোয়েন্দা। তাদের কমাণ্ডার গোয়েন্দা জগতের কিংবদন্তি পুরুষ আলী বিন সুফিয়ান।'

এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে তাদের মনে ভয়ানক আতংক সৃষ্টি হলো। এখন কি করবে এই চিন্তায় তারা অধীর হয়ে উঠলো। এখানে থাকা এখন বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ, আবার বেরিয়ে যাওয়াও কঠিন। মেয়েটি বললো, 'কি করবে জলদি

চিন্তা করে বের করো, আমি নাগর সামলাই।'

মেয়েটি ফিরে এলো সেই পাহারাদারের কাছে। নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রাখলো তাকে তাবুতে। খৃস্টানদের তাবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো এক লোক। সে আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পেল না।

আলী বিন সুফিয়ানকে না পেয়ে খৃস্টানটি আরো ঘাবড়ে গেলো। ভাবলো, তবে কি তিনি আমাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে গেছেন?

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে ফিরে এলো তার লোকদের কাছে। বললো, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! আলী বিন সুফিয়ান তার তাবুতে নেই। সম্ভবত আমাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে গেছে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না। জলদি পালাও সবাই।'

তখন রাত দ্বি-প্রহর। এ শহরে এরা নতুন। এখানকার পথঘাট, পরিবেশ কিছুই তাদের জানা নেই। দিনের বেলা হলে পথ একটা খুঁজে নেয়া তেমন কঠিন ছিল না। তাছাড়া জনারণ্যে মিশে হারিয়ে যাওয়া যেতো সহজেই। কিন্তু এই গভীর রাতে মেয়েদের নিয়ে পথে বের হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। ভেতরে ভেতরে ঘামতে লাগলো সবাই।

একজন পরামর্শ দিল, 'কোন হোটেলে গিয়ে উঠা যাক। বলবো, আমরা কায়রোর বণিক। বাইরে উন্মুক্ত ময়দানে এভাবে শুয়ে থেকে ধরা দেয়ার কোন মানে হয় না।'

অন্যরাও তার প্রস্তাবে রাজি হলো, 'সেই ভালো। কোন সরাইখানায় গিয়ে রাত কাটাতে পারলে সকালে উঠে গা ঢাকা দেয়া যাবে।'

তারা এক লোককে গোপনে সেই উদ্দেশ্যে বাইরে পাঠিয়ে দিলো। তাবু থেকে বেরিয়ে লোকটি চুপিসারে পাহারাদারের দৃষ্টি এড়িয়ে মাঠ থেকে রাজপথে উঠে গেলো। সরাইখানার খোঁজে সে শহরের গলিপথে হাঁটতে লাগলো।

সে হাঁটছে আর ভাবছে, সরাইখানা পেলে কষ্ট হলেও হয়তো আমরা সেখানে উঠে যেতে পারবো, কিন্তু আসবাবপত্র সরানো বড় সমস্যা হয়ে যাবে! প্রকাশ্যে বণিক হিসাবে আমাদের কাছে থাকার কথা ব্যবসায়িক পণ্য, কিন্তু মুসলমান আমীর ও সেনাপতিদের জন্য যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা, হীরা, জহরত ও বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকন আছে তা সরানো সহজ নয়। এগুলো সরাতে গেলেই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়! তখন আর বণিকের ছদ্মবেশ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এমন কোন আমীরের সাথেও এখানো পরিচয় হয়নি যার কাছে সাহায্যের জন্য যাওয়া যায়।

লোকটি জনশূন্য রাস্তা ধরে হাঁটছে। রাস্তার দু'পাশে দোকানপাটের ঝাপ বন্ধ। ডানে-বায়ে, সামনে-পেছনে কোথাও কোন লোককে দেখতে পেল না সে। কোন সরাইখানারও সন্ধান পেল না। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরির পর মনে হলো সামনের দিক থেকে একজন লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটাকে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ক্রমেই একটা মানুষের কাঠামো পরিষ্কার ভেসে উঠলো তার সামনে। আরেকটু কাছাকাছি হলে দেখা গেল লোকটার মাথা ও মুখের অর্ধেকটা চাদর দিয়ে ঢাকা। সাহস সঞ্চয় করে সে ডাকলো, 'এই যে ভাই, শুনুন। এদিকে কোন সরাইখানা পাওয়া যাবে?'

'শহরের এদিকটায় তো ভাই কোন সরাইখানা নেই! আর থাকলেও এত রাতে কোন সরাইখানার মালিক গেট খুলবে

না। এত রাতে সরাইখানা খুঁজতে বেড়িয়েছো কেন?'

'আজই এক বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে আমরা এখানে পৌঁছেছি। আমাদের সাথে চারটি মেয়ে আছে, তাদেরকে তাবুতে রাখা ঠিক না, এ জন্যই সরাইখানা খুঁজছি।'

অচেনা লোকটি চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ, এটাও একটা প্রশ্ন!' একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'কিন্তু তোমাকে সন্ধ্যার আগেই সে ব্যবস্থা করতে হতো।'

'জ্বি, তা আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তা তো করা হয়নি! এখন যে কি করি! এত রাতে....'

'এসো আমার সঙ্গে, দেখি তোমার কোন উপকার করা যায় কিনা! তুমি এক বিদেশী, এখান থেকে গিয়ে আমাদের বদনাম করে বেড়াবে, বলবে, দামেস্কে আমাদের পর্দানশীন মহিলারা খোলা মাঠে পড়েছিল জানার পরও ওখানকার কোন দ্বীনদার ভাই এগিয়ে আসেনি, তা হয় না। আজ রাতের মত ব্যবস্থা না হয় আমিই করে দেবো।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'আমি সরাইখানাতেই তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দেবো। চলো আমার সঙ্গে, তারপর গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসবে।'

'কিন্তু আমি এ শহরে একেবারেই নতুন। পথঘাট কিছুই চিনিনা। পথ হারানোর ভয়েই মেয়েদের রেখে বেশী দূর যাইনি। চলুন না, মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে একবারেই যাই!'

'কোন মাঠে বসিয়ে রেখেছো ওদের?'

'বেশি দূরে নয়। আসুন না, কাছেই।'

অচিন লোকটি তার সাথে চলতে লাগলো। উভয়েই তাবুর কাছে পৌঁছলে খৃস্টানটি তাঁকে তাবু দেখিয়ে বললো, 'ওই যে

আমাদের তাবু। আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি ওদের নিয়ে আসি।'

অচিন লোকটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে তাবুগুলোর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েকটি তাবুর পরই ছিল খৃস্টানদের তাবু। সে তার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললো, 'চলো। যাক বাবা, কপালগুণে লোকটির দেখা পেয়েছিলাম। নইলে সারা রাত পথে পথেই ঘুরতে হতো।'

সবাই উৎসুক হয়ে তাকাল তার দিকে। চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। সে সব কথা ওদের খুলে বলে তাড়া দিল তাদের, 'জলদি করো, লোকটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কতক্ষণ তিনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন? দয়া করে তিনি কোন সরাইখানায় আমাদের থাকার জায়গা করে দিতে রাজি হয়েছেন, এই তো ঢের।'

কিন্তু সঙ্গীদেরকে তার মতো উৎসাহী মনে হলো না। তার কথা শুনে তাদের মনে কেন যেন অজানা ভয় ঢুকে গেল। বললো, 'কিন্তু এ লোক যদি ধোকা দেয়?'

'কিন্তু আমরা এমন বিপদে পড়েছি, যার থেকে মুক্তির জন্য কোন না কোন বিপদের ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।' বললো সে।

অন্য একটি মেয়ে বললো, 'আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে জঙ্গী গোয়েন্দা দল নিয়ে কেন এখানে এসেছে আমরা তা জেনে গেছি। খলিফা ও আমীররা খৃস্টানদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করার কারণেই তাকে এ অভিযানে আসতে হয়েছে। যদি আমরা আলীর এ অভিযানের খবর খলিফা বা অন্তত কোন আমীরের কানেও দিতে পারতাম, তবে আমরা এখন যে বিপদে আছি তারচে বেশী বিপদে পড়তো আলী।'

'তা ঠিক। এ সংবাদ আমাদের পুতুল সরকারের খলিফাকে রাতেই পৌছে দিতে পারলে সরকারের কাছ থেকে মোটা অংকের বখশিশ পাওয়া যেতো।'

'বকশিশের কথা পরে চিন্তা করো। আগে এ সংবাদ খৃস্টান শাসকদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করো, যাতে তারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর রাস্তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারে।'

অন্য একজন বললো, 'এসব আলাপ পরে আরো করা যাবে, এখন দ্রুত সব গুছিয়ে নিয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।'

বেরিয়ে পড়ার জন্য ওরা গোছগাছ শুরু করলো। মেয়েটির তাবুতে খবর দিতে গিয়ে দেখা গেল পাহারাদার গভীর ঘুমে অচেতন। সবাই মেয়েটির কাজের উচ্চ প্রশংসা করলো।

আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গীরা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পাহারাদার ঘুমিয়ে আছে মেয়েটির তাবুতে। এই অবসরে সকলে একত্রেই বেরিয়ে এলো তাবু থেকে। আসবাবপত্র, মালামাল ও পশুগুলো পড়ে রইলো ওখানেই।

মালামাল নিয়ে তাদের এখন আর ভাবনা নেই। আগামীকাল যখন ছদ্মবেশী আলী ও তার গোয়েন্দা বাহিনীকে ধরিয়ে দেবে তখন তাদের মালসামান তারা এমনি পেয়ে যাবে।

তারা তাবু থেকে বেরিয়ে এলো। ধীর পায়ে লোকটিকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেখানে এগিয়ে গেল। কিন্তু ওখানে পৌছে লোকটিকে দেখতে পেলো না ওরা। এদিক-ওদিক তকালো, আশেপাশে কোন জনমানুষের চিহ্নও নেই।

অজানা ভয় ও আতঙ্ক আবার ঘিরে ধরলো ওদের। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। ওরা যখন চরমভাবে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা তখন হঠাৎ অন্ধকার থেকে একদল লোক

উঠে দাঁড়ালো এবং তাদের ঘিরে ফেললো।

তাদেরকে ঘেরাও করে তাবুর ওখানে নিয়ে এলো কমাণ্ডোরা। মশাল জ্বালিয়ে মশালের সামনে তাদের বসিয়ে রেখে খবর দিল আলী বিন সুফিয়ানকে।

খবর পেয়ে তাবু থেকে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এলেন আলী বিন সুফিয়ান। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?' তারা মিথ্যা উত্তর দিলে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'কিন্তু আমি তো জানি তোমরা সরাইখানা তালাশ করছিলে! আমাকে কি বলবে, কে সরাইখানার সন্ধানে ঘুরে মরছিলে?'

একজন অপরাধীর মত স্বীকার করে বললো, 'জ্বী, আমি!'

'আর যাকে তুমি সরাইখানার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলে, সে ব্যক্তি আমি!' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

সবাই বিস্মিত হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। মুজাহিদরা ভাবছিলো, একেই বলে আল্লাহর গায়েবী মদদ! নইলে তাওফীক জাওয়াদের ঘর থেকে তাবুতে ফেরার সময় এই লোক তার সামনে পড়বে কেন? আর আলী বিন সুফিয়ানের কাছে সে সরাইখানার রাস্তাই বা খুঁজতে যাবে কেন?

অন্ধকারেও খৃস্টান গোয়েন্দার প্রথম কথাতেই আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেলেছিলেন, সে কে এবং কি করছে। তিনি জানতেন, এসব খৃস্টান গোয়েন্দার আশ্রয়স্থল হচ্ছে কোন আমীরের মহল! কিন্তু তিনি সে পর্যন্ত তাকে পৌঁছার সুযোগ দিলেন না। লোকটিকে সঙ্গে নিয়েই তিনি তাবু পর্যন্ত চলে এলেন। খৃস্টান গোয়েন্দা যখন তাঁকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে তাবুর ওখানে গেল তখন তিনি মনে মনে খুশিই হলেন।

খৃস্টানটি তাবুর ভেতর ঢুকে যেতেই আলী বিন সুফিয়ান দ্রুত ক্যাম্পে গিয়ে কয়েকজন জানবাজকে চুপিসারে ডেকে

তোললেন। চটজলদি তাদের বুঝিয়ে বললেন, এখন কি করতে হবে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া শেষ করেই তিনি তাদের তাবু থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন খৃস্টানদের তাবুর ওখানে। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন তাবুর আড়ালে; চুপ করে শুনতে লাগলেন তাদের কথা। তাদের আলোচনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, খৃস্টান গোয়েন্দারা তাঁর মিশন সম্পর্কে সব খবরই জেনে ফেলেছে। কিন্তু এসব গোপন তথ্য কেমন করে ফাঁস হলো ভেবে পেলেন না তিনি।

ততক্ষণে মুসলিম কমাণ্ডোরা বর্শা হাতে আলীর নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে ওঁৎ পেতে বসে পড়েছে। খৃস্টানরা যখন সেখানে গিয়ে আলীকে না পেয়ে হতভম্ব, তখন তারা এক যোগে তাদের ঘিরে ধরল এবং বন্দী করে নিয়ে এলো ক্যাম্পে।

'বন্ধুগণ!' আলী বিন সুফিয়ান তাদের বললেন, 'গোয়েন্দা হিসাবে তোমরা খুবই কাঁচা। তোমাদের আরো প্রশিক্ষণের দরকার ছিল। গোয়েন্দারা কি এমন নির্জন রাস্তায় বেখেয়ালে হেঁটে বেড়ায়? গোয়েন্দারা কি লোক না চিনেই গোপন কথা ফাঁস করে দেয়? গোয়েন্দাগিরি করতে হলে তার কলাকৌশল আমার কাছ থেকে শিখে নাও।'

'আপনি আপনার কলাকৌশল নিজের লোকদের আগে ভাল করে শিখিয়ে দিন, তাতেই আপনার মঙ্গল হবে। আনাড়ি লোকদের সাথে নিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে নামা আসলেই বিপদজনক।' এক খৃস্টান বললো, 'আপনার লোকদের কাছ থেকে আপনার সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা, আপনার মিশনের খুটিনাটি খোঁজখবর আবিষ্কারের কৃতিত্বটুকু আমরা আমাদের যোগ্যতাবলেই করেছি। আপনার হাতে ধরা পড়েছি, এটা তো

একটা ভাগ্যের খেলা। আপনি জিতে গেছেন, আর আমরা হেরে গেছি। যদি আমাদের লিডার মারা না পড়তো, তবে এর উল্টোটিও তো ঘটতে পারতো!'

'আমাকে কি বলবে, কে তোমাদের কাছে আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস করেছে?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

'সে লোক এখন আমার তাবুতে ঘুমাচ্ছে।' একটি মেয়ে তার তাবুর দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললো, 'সে আমার ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।'

কিন্তু আলী আলাপ আর দীর্ঘ করতে চাইলেন না। বললেন, 'এসব কথা এখন থাক, কায়রো গিয়েই বাকী আলাপ হবে।'

উটের ওপর বাণিজ্য সামগ্রী বোঝাই করা। নানা রকম প্যাকেট, তাবুর বাণ্ডিল, কতকিছু। সেই বাণ্ডিলের মধ্যে আরো কয়েকটি বাণ্ডিল বাড়লো। আলী বিন সুফিয়ান ও তার গুটিকয় কমাণ্ডো ছাড়া অন্য কেউ জানতেও পারলো না, জড়ানো তাবুর মধ্যে আছে মেয়ে-পুরুষ মিলে নয়জন খৃস্টান গোয়েন্দা। তাদের কি হাল হলো, তারা দমবন্ধ হয়ে মারা গেল, না বেঁচে আছে, এ নিয়েও যেনো কারো কোন চিন্তা নেই।

কাফেলা দামেস্ক ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছে। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন আলী। না, শহরের চিহ্নও আর দেখা যায় না। আশেপাশে কোন লোকালয় চোখে পড়ে না।

আলী কাফেলাকে থামতে বললেন। খৃস্টানদেরকে তাবুর বাণ্ডিল থেকে মুক্ত করলে দেখা গেল সকলেই বেঁচে আছে। তিনি মেয়েদেরকে উটের ওপর এবং পুরুষদেরকে ঘোড়ায়

তুলে কাফেলাকে আবার রওনা হতে বললেন।

খৃষ্টানরা তাদের মুক্তির জন্য আবেদন করে বললো, 'আমাদের সমস্ত অর্থ সম্পদ, হীরা-জহরত, সোনার থলি, যেগুলো খলিফা ও আমীরদের উপহার দেয়ার জন্য এনেছিলাম, সব আপনাদের দিয়ে দেবো। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিন।'

আলী বিন সুফিয়ান হেসে বললেন, 'ওসব তো এমনিতেই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে!'

০

সে সময় ত্রিপলীর সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় রিমেন্স। এখনকার লিবিয়ারই আগে নাম ছিল ত্রিপলী, বর্তমানে তা লিবিয়ার রাজধানী। নূরুদ্দিন জঙ্গীর ইন্তেকালে জেরুজালেম ও আশেপাশের শাসকদের মত দ্বিতীয় রিমেন্সও খুশী হয়েছিলেন। সেই খুশি উপভোগের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশের সম্রাট ও খৃষ্টান সেনাপ্রধানদের এক কনফারেন্স ডাকলেন।

সে সম্মেলনে কি সব গোপন পরিকল্পনা হয়েছিল বাইরের কেউ তা জানতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল সে বৈঠক থেকে ফিরে কয়েকদিন পরই সেরিজ নামে এক ইংরেজ কমাণ্ডার তার সামরিক বাহিনীকে হলব পর্যন্ত নিয়ে গেলো। সে সময় হলবের আমীর ছিলো শামসুদ্দিন। সেরিজ তাঁকে পয়গাম পাঠালো, 'হয় হলব আমার হাতে তুলে দাও নতুবা আমার মোকাবেলা করার জন্য তৈরী হও।'

শামসুদ্দিন ভয়ে দামেস্ক ও মুসালের আমীরের কাছে সাহায্য চাইলো। কিন্তু তারা সাহায্য করার পরিবর্তে নিজেরাই তা দখল করার উদ্যোগ নিল। অবস্থা বেগতিক দেখে শামসুদ্দিন খৃষ্টানদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে নিজের প্রাণ রক্ষা করলো।

এভাবেই খৃস্টানরা নতুন করে সফলতার সূচনা করলো।

খৃস্টানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, মুসলমান আমীররা একে অন্যকে সাহায্য করার পরিবর্তে অন্য রাজ্য আক্রমণ করতে চায়। সে কারণে তারা যুদ্ধ ছাড়াই কেবল ভয় দেখিয়ে মুসলিম রাজ্যগুলো দখল করার পায়তারা করতে লাগল। তাদের ভয় শুধু একটি, সুলতান আইয়ুবী। সুলতান আইয়ুবীর শক্তি ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তারা সজাগ ছিল। তাদের ভয়, যদি সুলতান আইয়ুবী তাদের মোকাবেলায় সমস্ত আমীরদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তবে তাদের আশার গুড়ে বালি পড়বে। সে জন্য তারা তাদের অনুগত আমীরদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলো।

রিমেন্স খলিফাতুলমুলক আবু ছালেহ-এর কাছে উপঢৌকন ও দূত পাঠিয়ে জানালো, 'যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন, তবে আমরা আপনাকে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্যও দিতে প্রস্তুত আছি।'

সুলতান আইয়ুবী কায়রোতে বসে অধীর আগ্রহে আলী বিন সুফিয়ানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সময় যেন আর যায় না। ভেতরে ভেতরে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। আলী বিন সুফিয়ানের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করছে তার সমস্ত পরিকল্পনা। তিনি মানসিক ভাবে বাগদাদ, দামেস্ক ও ইয়েমেনে সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু এক সাথে তা সম্ভব নয়।

এদিকে মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল না। সৈন্য সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। অবস্থা যা তাতে তিনি মিশর থেকে খুব বেশী সৈন্য সঙ্গে নিতে পারবেন না। এটিই ছিল তার বড় ভয়

ও শংকার কারণ। এত অল্প সৈন্য নিয়ে তিনি কি সফল হতে পারবেন? অথচ সামরিক অভিযান ছাড়া এ সমস্যার মোকাবেলায় তিনি দ্বিতীয় কোন পদক্ষেপের কথা চিন্তাই করতে পারছেন না।

অপেক্ষার প্রহর বড় যন্ত্রণাময়। প্রতিদিন তিনি দিনে একাধিকবার বাড়ীর ছাদে উঠে যান। দূর দিগন্তে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা। আলী বিন সুফিয়ানের আসার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

সেদিনও তিনি এমনিভাবে তাকিয়ে ছিলেন দূর দিগন্তে। হঠাৎ তিনি বহু দূরে ধূলির মেঘ দেখতে পেলেন। ভূমি থেকে ধূলির মেঘ উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। সুলতান আইয়ুবী সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। ধূলির মেঘ ক্রমশ: এগিয়ে আসতে লাগলো। এক সময় তার মধ্য থেকে ঘোড়া ও উটের পাল দেখা গেল।

ওটাই ছিল আলী বিন সুফিয়ানের কাফেলা। তাঁরা রাস্তায় খুব কমই বিশ্রাম নিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতেও এবার ভেসে উঠলো কায়রোর মিনার। সাথে সাথে তাদের চলার গতি বেড়ে গেল। তীব্র গতিতে উট ও ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটে আসতে লাগলেন তারা। তাঁরা জানতো, তাদের এ সফরে সময়ের মুল্য কত? সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁদের অপেক্ষায় কি অধীর প্রহর গুণছেন।

শেষ হলো প্রতীক্ষার প্রহর। ধূলোয় মলিন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইয়ুবীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সুলতান আইয়ুবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন অফিস কক্ষে। তাকে কাপড় ছাড়ারও সুযোগ দিলেন না, অধীর আগ্রহে

বললেন, 'বলো, কি খবর নিয়ে এসেছো?'

আলী বিন সুফিয়ান বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করলেন সুলতানের সামনে। নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর আবেগভরা বক্তব্য শোনালেন। সেনাপতি তাওফিক জাওয়াদের সাথে যে আলোচনা হয়েছিল তা শোনালেন। শেষে তিনি বললেন, 'দামেস্ক থেকে আপনার জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি। এ উপহার হচ্ছে, পাঁচজন খৃস্টান পুরুষ ও চারজন মেয়ে। সন্ধ্যার আগেই তারা আপনার জন্য আরো মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করবে বলে আশা রাখি।'

'তার মানে, আমাকে অভিযানে বেরুতেই হচ্ছে?' বললেন সুলতান আইয়ুবী।

'হ্যাঁ সুলতান, এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'তবে আমি আশা করি গৃহযুদ্ধ হবে না।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁর দু'জন উপদেষ্টাকে ডাকলেন, যাদের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁরা এলে তিনি তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের এখন যে কথা বলবো, তা অন্তরে গেঁথে নেবে। তোমরা দু'জন ছাড়া এসব কথা আর জানবে শুধু আলী। এ ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ যেন এই গোপন কথা জানতে না পারে।'

তিনি তাঁদেরকে দামেস্ক ও অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের আমীরদের অবস্থা ও বিলাসিতার কথা শোনালেন। আলী বিন সুফিয়ানের সংগৃহীত রিপোর্ট শুনালেন আর বললেন, 'আল্লাহর সৈনিক আল্লাহর আদেশই পালন করে থাকে। খলিফার আদেশ মান্য করা আমাদের ওপর ততক্ষণ ফরজ যতক্ষণ তাঁরা আল্লাহর বিধানের অনুসারী থাকে। কিন্তু আমীর ও খলিফা যদি আল্লাহর মহান দ্বীন ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহর পরিবর্তে নিজের

খাহেশের গোলাম হয়ে যায়, তখন আল্লাহর সিপাহীর ওপর ফরজ হয়ে যায় তার বিরোধিতা করা।

যদি আমার অস্তিত্ব মিল্লাতের জন্য বিপদ ও কলংকের কারণ হয়, তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার নেতৃত্ব ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া। প্রয়োজন হলে আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে কয়েদখানায় আটকে রাখবে. প্রয়োজন হলে আমার শির ছিন্ন করবে দেহ থেকে, কিন্তু দেশ থেকে আল্লাহর আইন উৎখাত হতে দেবে না।

সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন বলবৎ ও জারি রাখা হলো আল্লাহর সৈনিকদের মূল দায়িত্ব। আল্লাহর সৈনিক তারাই, যারা আল্লাহকে মুনীব ও মালিক বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ মুসলমান মাত্রই আল্লাহর সৈনিক, এ দায়িত্বও তাই প্রতিটি মুসলমানের কাঁধে ন্যস্ত।

একজন মুসলমান হিসাবে এ দায়িত্ব আমি এড়িয়ে যেতে পারিনা। যে খলিফা মিল্লাতের ইজ্জত, সম্মান ও গৌরববোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রুদের সাথে মিতালি করছে, শত্রুর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছে, তাদের গোয়েন্দাদের আশ্রয় দিচ্ছে, তার কবল থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করা আজ ফরজ হয়ে গেছে।

তার আমীররা আজ খৃস্টানদের আজ্ঞাবাহী, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার গোলাম। তাদের সহায়তায় মুসলিম রাজ্যগুলো আজ শত্রুদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। হালবের আমীর শামসুদ্দিন খৃস্টানদের কাছে অস্ত্র পর্যন্ত সমর্পন করে দিয়েছে। খলিফা এখন মুসলমান নয় খৃস্টান স্বার্থের রক্ষক। পুতুলের মত খলিফাকে চেয়ারে বসিয়ে মুসলিম মিল্লাতের ওপর আধিপত্য চালাচ্ছে খৃস্টানরা। এ অবস্থায় খলিফাকে

গদিচ্যুত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা কি আমাদের ওপর ফরজ হয়ে যায়নি? ইসলামের সম্মান রক্ষায় সেনাবাহিনী নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া কি আমাদের ঈমানের দাবী নয়?'

'হ্যাঁ, এটা আমাদের ঈমানের দাবী। খলিফার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের ওপর।' দু'জন উপদেষ্টা একই সঙ্গে বলে উঠলো।

'তাহলে কিভাবে এগুনো যায় এসো সেই পরিকল্পনা করি। এ পরিকল্পনার গোপনীয়তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আমরা চারজন ছাড়া এ বিষয় আর কেউ জানবে না।'

সুলতান আইয়ুবী উপদেষ্টাদের নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন।

খৃস্টান গোয়েন্দা ও মেয়েদেরকে আলী বিন সুফিয়ান এক অন্ধকার গোপন কক্ষে নিয়ে গেলেন। বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সচরাচর তিনি এ কক্ষটিই ব্যবহার করেন।

'তোমরা এমন এক জাহান্নামে প্রবেশ করেছ, যেখানে তোমরা বাঁচার মত বাঁচতেও পারবে না, আর মরতেও পারবে না। তোমাদের দেহকে কংকালের আকৃতি বানানোর আগেই আমার কাছে সুস্থ্য অবস্থায় সত্য কথা বলে দাও, আর এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করো। আমি তোমাদের চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছি। একটু পরেই আমি আবার আসবো।'

আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে বেড়ী পরানোর আদেশ দিলেন। এক খৃস্টান চিৎকার করে বললো, 'আমাদের শাস্তি দেয়ার আগে আমাদের কথা শুনুন। আমরা বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। শাস্তি হওয়া উচিত আমাদের যারা এ কাজে

পাঠিয়েছে তাদের। তাদের সম্পর্কে সব কথা আমরা আপনাদের বলে দেবো। দয়া করে আমাদের ওপর রহম করুন। অন্তত এই অবলা মেয়ে কয়টিকে শাস্তি থেকে রেহাই দিন।'

'তাদের গায়ে কেউ হাতও দেবে না।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন; 'তোমরা আমাদের কাজ সহজ করে দাও, তোমাদের মেয়েরা তোমাদের কাছেই থাকবে। এই অন্ধকার কারাগার থেকে সকলকে মুক্তি দেয়া হবে। আমরা মিথ্যা ওয়াদা করি না, সব কথা খুলে বললে তোমাদেরকে বড়জোর সম্মানের সাথে নজরবন্দী রাখা হবে।'

নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর খৃস্টানরা যেসব গোপন পরিকল্পনা করেছিল সন্ধ্যার আগেই আলী বিন সুফিয়ান সে সব তথ্য তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিলেন। মৃত্যু ভয়ে ভীত খৃস্টান গোয়েন্দারা জানতো গুপ্তচরদের সাথে প্রতিপক্ষ কেমন ব্যবহার করে। আলীর আশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে তারা সঠিক তথ্যই দিল আলীকে, যাতে সত্যতা যাচাই করতে গেলে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। তারা আশা করলো এতে তারা কিছুটা হলেও অনুকম্পা চাওয়ার হকদার হবে।

০

তিন দিন পর। মিশরের সীমান্ত থেকে অনেক দূরে, উত্তর পশ্চিম দিকে মাটির উঁচু উঁচু টিলা ও গিরিপথ সমৃদ্ধ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। টিলা ও গিরিপথের ফাঁকে মাঝে মাঝে রয়েছে সবুজ মাঠ ও পানির উৎস। সবুজের ছোঁয়া থাকার পরও ছোট বড় অসংখ্য টিলার কারণে অঞ্চলটি দুর্গম। সাধারণ মরু কাফেলা কখনো এ পথে পা বাড়ায় না ভয়ে এবং পথ হারানোর শংকায়।

এ অঞ্চলেই টিলার আড়ালে এক বড়সড় মাঠে দেখা গেল

অসংখ্য ঘোড়া। তাদের আরোহীরা শুয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে. এক জায়গায় ছোট একটি তাবু টানানো। তাবুর ভেতর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন এক লোক। এ লোকটি আর কেউ নন, স্বয়ং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

ছোট এক তাবুতে শুয়ে আছেন সুলতান আইয়ুবী। এখানে সেখানে শুয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে আইয়ুবীর অশ্বারোহীরা। তাদের সংখ্যা মাত্র সাতশো।

সুলতান আইয়ুবী অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি দামেস্কে যাবেন খুব কম সৈন্য নিয়ে। যদি সুলতান হিসেবে মর্যাদা দিয়ে খলিফা তাকে আলোচনার সুযোগ দেন তবে ভাল, আর যদি বাঁধা দেয়, তবে এ স্বল্প সৈন্য নিয়েই তিনি মোকাবেলা করবেন তাদের।

তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্য থেকে এমন সাতশো সৈন্য বাছাই করেছেন, যারা বহু যুদ্ধে বার বার বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এর মধ্যে আছে গেরিলা বাহিনীর অশ্বারোহীরা, যারা শত্রুর ওপর ঝটিকা হামলায় পারদর্শী। এরা কেবল কুশলীই নয়, আবেগদীপ্ত, উচ্ছল, প্রাণময়। ক্রুসেডদের নাম শুনলেই এদের চোখ রাগে রক্তলাল হয়ে যায়। সেনাবাহিনীতে এরা 'ক্রাকের বীর অশ্বারোহী' গ্রুপ বলে পরিচিত।

অত্যন্ত গোপনে রাতের অন্ধকারে সুলতান আইয়ুবী এদেরকে কায়রো থেকে বের করে নিয়ে আসেন এই দুর্গম অঞ্চলে। সুলতানের নির্দেশ পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই একা এবং বিচ্ছিন্নভাবে শহর থেকে বেরিয়ে সবার অলক্ষ্যে এখানে এসে সমবেত হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া পাশের সৈনিকটিও টের পায়নি তার সাথী গোপনে কোন অভিযানে চলে যাচ্ছে।

ওদেরকে এখানে এসে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে

সুলতান নিজেও কায়রো থেকে গোপনে বেরিয়ে আসেন। শুধু আলী বিন সুফিয়ান ও উপদেষ্টা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানেন না সুলতান আইয়ুবী এখন কোথায়? সুলতানের রক্ষী বাহিনী যথারীতি কায়রোতে তার হেড কোয়ার্টার পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। তারাও জানে, সুলতান আইয়ুবী কায়রোতেই আছেন।

কায়রো এবং তার আশেপাশে খৃস্টান গোয়েন্দারা সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল সুলতানের গতিবিধির ওপর। খৃস্টান গোয়েন্দাদের মধ্যে মিশরের কিছু গাদ্দার মুসলমানও ছিল। এদের মধ্যে আবার কিছু ছিল সরকারী চাকুরে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ওরা কেউ জানতে পারলো না, সুলতান আইয়ুবী সাতশো বাছাইকৃত অশ্বারোহী নিয়ে কায়রো থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তিন চারজন লোক টিলার উপরে টহল দিচেছ। চারজন পাহারা দিচ্ছে নিচে। সকলের অগোচরে এ বাহিনী রওনা দিয়েছে দামেস্কের পথে। সুলতান আইয়ুবীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে এক স্পর্শকাতর লড়াইয়ে। খৃস্টানদের তল্পীবাহক খলিফা ও গাদ্দার আমীরদের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা তাদের চোখে মুখে।

আক্রা থেকে প্রাণ নিয়ে কোন মতে পালিয়ে এল ইমরান। সঙ্গে নিয়ে এল মহামূল্য গোপন খবর। ছুটে আসছে খৃষ্টানদের সম্মিলিত নৌবাহিনীর বিশাল বহর। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকেও ধেয়ে আসছে সুবিশাল বাহিনী। আইয়ুবীর অজ্ঞাতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জন্মের মত যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেয়ার স্বপ্ন তাদের। সারা ইউরোপ থেকে এ জন্য বাছাই করা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের। তাদের ধারনা, আইয়ুবীর সাথে এটাই তাদের শেষ লড়াই। এ লড়াইয়ের পর আইয়ুবী বলে কেউ থাকবে না দুনিয়ায়। তারপর? তারপর কি ঘটেছিল সে কাহিনী নিয়ে বেরোল

ক্রুসেড-৯

উপকূলে সংঘর্ষ

পরবর্তী বই

ক্রুসেড-১০

সর্প কেল্লার খুনী

প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা